ওয়াসি আহমেদের গল্পবিশ্ব

তপোধীর ভট্টাচার্য

আমরা এখন এমন এক সঙ্কটের মধ্যে রয়েছি যার সূচনাই শুধু দেখতে পাচ্ছি, এর জটিলতা ও শাখা-প্রশাখা কতদিকে বিস্তৃত হবে আমাদের জানা নেই। নিত্যন্ত বাইরের স্তরে কিছু ঢেউ ও আবর্ত দেখেই আমরা ত্রস্ত, এর তলদেশে কী আছে তা ভাবতেও ভয় পাচ্ছি। এসময় মানুষ নামক প্রাণী তার এতদিনকার তৈরি অভ্যাসের খিলানগুলিকে নির্দয় জল্লাদের ক্রুরতায় ও ক্ষিপ্রতায় একটি-একটি করে ভেঙে ফেলছে। মুছে নিচ্ছে তার সমস্ত সম্পর্কের জমি ও আকাশ। তাই আমরা একে অন্যের অচেনা, তিক্ত, বিবর্ণ ঝাপসা মুখ দেখে আঁতকে উঠেছি। অতীতের স্মৃতিতে স্বস্তি নেই, ভবিষ্যতের স্বপ্নে ভরসা নেই, ঘটমান বর্তমানে আস্থা নেই। ভেঙে যাচ্ছে মানুষ চৌচির হয়ে, তার কোথাও কোনও পরিসর নেই। এমনকী নিজের সময়কেও সে নিশ্চিতভাবে শনাক্ত করতে পারছে না। তার কোনও যাত্রা নেই, নেই গন্তব্যও। তাই সঙ্কটের কথা ঠিকমতো বলা যাচ্ছে না। বয়ানে থাকছে না কোনও নিরবচ্ছিন্নতা; বরং পরস্পর-সম্পর্কবিহীন মুহূর্তপুঞ্জ কিংবা বৃত্তান্তশূন্য ঘটনার সমাবেশ দিশাশূন্য করছে পাঠকদের।

এ সময় অন্তর্জাল হয়ে উঠেছে আব্রহ্মস্তম্ভের বিকল্প। প্রত্যন্ততম গ্রামের স্থবিরতা একাকার হয়ে যাচ্ছে গতির নেশায় উন্মাদ মহানগরের সঙ্গে। মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান দ্রুত অবান্তর হয়ে পড়ছে। অন্তর্জালের প্রশ্রয়পুষ্ট প্রতিভাষা ও অতিচিহ্নায়নের তোড়ে বেসামাল এখন ভাষার স্থাপত্য, প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা। তাহলে, এই প্রতিমানবিক পরিস্থিতিই তো এখনকার কাহিনি-রিক্ত 'গল্প'।

সাম্প্রতিক কথাকারেরা কি কথাবিশ্বের ওপর নেমে আসা এই অসংযোগের সন্ত্রাস ও কুহক সম্পর্কে অবহিত? কীভাবে তবে এহেন ধূসর ও নিরবয়ব সময়ের 'গল্প' লিখেছেন তাঁরা! প্রতিভাষা-প্রতিমানবিকতা-অতিচিহ্নায়নের মোকাবিলা করা যে তৃতীয় সহস্রাব্দের সূচনায় আবশ্যিক হয়ে পড়েছে, তা কি বাংলা ভাষার কথাকারেরা অনুধাবন করেছেন? এইসব প্রশ্নমালায় যখন বিক্ষত হচ্ছি, তখনই এই নিবন্ধকারের হাতে এসে পৌঁছল ওয়াসি আহমেদের *নির্বাচিত গল্প*। এর আগেই পড়া হয়ে গিয়েছিল তাঁর এই কয়েকটি গল্প-সংকলন– *বীজমন্ত্র* (১৯৯৮), *তেপান্তরের সাঁকো* (২০০১) ও *শিঙা বাজাবে ইসরাফিল* (২০০৬)। যদিও প্রথমোক্ত সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল বিশ শতকের শেষে, তবু পাঠ-অভিজ্ঞতার সূত্রে বলতে পারি, পরবর্তী দুটি সংকলনের শিল্পকলা ও নিষ্কর্ষ উপলব্ধির জন্যে তা অপরিহার্য। এর আগে ও

পরে বেরিয়েছে আরো কয়েকটি গল্পগ্রন্থ – *ছায়াদণ্ডি ও অন্যান্য* (১৯৯২), *ত্রিসীমানা* (২০০৯), *কালাশনিকভের গোলাপ* (২০১২), *বক ও বাঁশফুল* (২০১৬), *শৈত্যপ্রবাহ* (২০১৮)।

বাঙালির ভাষা ও সাহিত্য অবিভাজ্য, এই মৌল সত্যটি আরও একবার প্রমাণ করে দিয়েছেন ওয়াসি। তাঁর গল্পবিশ্ব নিশ্চয় নির্দিষ্ট ভূগোলের এবং সামাজিক চিহ্নায়ন আর সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গে আধারিত। তবু রাষ্ট্র-পরিচয়গত ভিন্নতা সত্ত্বেও ওয়াসির কথাকতা মূলত সময়-দগ্ধ পরিসর-বিচ্যুত বাঙালির সঙ্কট নিয়ে। বাংলা ভাষার সূক্ষ্ম প্রয়োগের মাধ্যমে সর্বব্যাপ্ত প্রতিভাষা ও প্রতিমানবিকতার কুহকী সন্ত্রাসের মোকাবিলা করেছেন যেহেতু গল্পকার, যে-কোনও ভূগোলের বাসিন্দা বাঙালির পক্ষে গল্পকৃতিগুলি অবশ্যপাঠ্য। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রয়াণের পরে এমন একজন গল্পকারকে পাওয়া গেল যাঁর গল্পভাষায় একই সঙ্গে পাওয়া যায় রুক্ষতা ও আর্দ্রতা, বিষাদ ও শ্লেষ, উদাসীনতা ও লিপ্ততা। আসলে বিশ্ববীক্ষা ও ছোটগল্পের শিল্পদায় সম্পর্কিত প্রতীতির নিরিখে দু'জন সহযাত্রী বলেই পূর্বসূরির সঙ্গে উত্তরসূরির সাযুজ্য রয়েছে। তাই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মতো ওয়াসি আহমেদ আমাদের অবিভাজ্য বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ।

॥ দুই ॥

বীজমন্ত্র সংকলনে অন্তর্ভুক্ত ন'টি গল্পের রচনাকাল ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৬। তার মানে, বিশ শতকের অন্তিম দশকের সূদূরপ্রসারী ভাঙচুর ও মানুষের অবমূল্যায়ন নিম্নলিখিত ছোটগল্পগুলির আধেয় : বীজমন্ত্র, বধ্যভূমি, গর্তসন্ধান, নাগাল, লোকমান হাকিমের স্বপ্নদর্শন, চক্রবৃদ্ধিসহ আটটি গল্প লেখা হয়েছিল ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৯-এর মধ্যে। এসময় পৌরসমাজ ও রাজনৈতিক সমাজে অন্ধকার আরও গাঢ়তর হয়েছে; মানুষের জগতে নানামাত্রায় জান্তবতার অভিব্যক্তি দেখা গেছে। গল্পকৃতিগুলি যেন হয়ে উঠেছে রূপক-বাস্তবের শ্লিষ্ট অভিব্যক্তি। ২০০১-এ প্রকাশিত পরবর্তী সংকলন *তেপান্তরের সাঁকো*-য় রয়েছে আটটি গল্প, যাতে স্মরনীয় রচনা খাঁচা ও অচিন পাখি, শেরশাহ্ ও তার অমোঘ পরিণতি, ডলফিন গলির কুকুরবাহিনি, অপুর ধর্মটিচার অন্তর্ভুক্ত। ২০০৬-এ প্রকাশিত *শিঙা বাজাবে ইসরাফিল*-এ ঋতুচক্র (১৯৯৩) ছাড়া অন্য ন'টি ছোটগল্পের রচনাকাল হল ২০০০ থেকে ২০০৫। এই গল্পকৃতিগুলিতে ওয়াসি আরও শাণিত ও সূক্ষ্মতাসন্ধানী; গল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম : ছোঁয়া, বনসাইয়ের স্বপ্ন, কলাপাতা-শাড়ি ও হাবুল সেখের বাড়ি ফেরা, আমাদের মীনা, মধ্যদিনের গান, শিঙা বাজাবে ইসরাফিল, শীত-পিপাসার দেও-দানব ও

ভারহীন দৃষ্টিহীন। এ আলোচনায় এই রচনাগুলো দিয়ে শুরু করে পরবর্তী সময়ে লিখিত কয়েকটি গল্প নিয়ে কথা বলা যাবে।

॥ তিন ॥

বীজমন্ত্র সংকলনের নাম-গল্পটি পড়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। এ তো নির্বীর্যীকৃত সাম্প্রতিক পৃথিবীর কথকতা। কোথাও ব্যক্ত রাজনীতি নেই অথচ এমন রাজনৈতিক অন্তঃসারসম্পন্ন ছোটগল্প ইদানীং পড়েছি বলে তো মনে হয় না। গল্পভাষার পরতে-পরতে মিহি-কুয়াশার মতো আগাগোড়া মিশে আছে স্যাটায়ার, কিন্তু একটিবারের জন্যেও তা উচ্চকিত নয়। তাই এর আবেদনও এক অব্যর্থ, অমোঘ। ওয়াসি অবশ্য এই গল্পের পরাপাঠ কী, তা এক জায়গায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন : 'ষাঁড়কে বলদ, কিংবা পাঁঠাকে খাসী করা হত মানুষের প্রয়োজনে– আজও করা হয়, স্বার্থের প্রয়োজনে। কিন্তু আজকাল মানুষ নিজেকে কাস্ট্রেট করছে প্রতিনিয়ত– অফিস, সংসার, ব্যাবসা, রাজনীতি, ধর্মবিশ্বাস, সবখানে। উপায় নেই, মানুষ নিজের স্বার্থেই বন্দি হচ্ছে, বিশেষ করে এস্টাব্লিশমেন্টের । মেন্টেল কাস্ট্রেশন।' প্রতিবেদনের সীমানা ছড়িয়ে প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাবন্দী সেবাদাসদের তীব্র ঘৃণা ও ধিক্কার উচ্চারিত হয়েছে যেন। 'বীজমন্ত্র' সার্থক ছোটগল্প হয়ে উঠেছে অন্তিম পর্যায়ে প্রৌঢ় তপুর কাছে তরুণ তপুর উপস্থাপনায়। আত্মসমর্পিতদের মিছিল অব্যাহত রয়েছে, থাকবে– এই হল বার্তা। তবে সময়ের ব্যবধানে নতুন প্রজন্মের তপুর কোনও দোটানা নেই, পিছুটান নেই; কিন্তু অন্তিম ব্যক্যে দেখি, পুরোনো তপুর 'দোটানা-টা যাই-যাই করেও যাচ্ছে না।' বিমানবায়িত সত্তার সঙ্গে নির্মাণবায়িত সত্তার এই জরুরি ব্যবধানেই সূক্ষ্মভাবে উপস্থিত রয়েছে বিভঙ্গবহুল সময় এবং সেখানেই গল্পত্ব। বন্ধ্যাত্ব যখন সার্বিক, তপুকে ব্যক্তি বলে ভাবতে পারি না কখনও; সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত বন্ধ্যা বলেই গল্পকারের পক্ষে সম্ভব হয় না উত্তরণের ইশারা করা।

'বধ্যভূমি' এমন-এক আশ্চর্য ছোটগল্প যা অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে পাঠককে টেনে নিয়ে যায় বাস্তব থেকে বাস্তবের বাইরে। মৃত্যুর ষোল বছর পরে তরিবত কি ফিরে আসে জীবিত মানুষদের মাঝখানে? অলৌকিক ঘটনায় সহজেই বিশ্বাস করে অজ পাড়াগাঁয়ের মানুষজন, এই সত্যকে কাজে লাগিয়েছেন গল্পকার। কিন্তু এ তো ভূতের গল্পও নয়। মূল বয়ান শুরু করার আগে ওয়াসি টি এস এলিয়টের *দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড* থেকে তিনটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করেছেন যাতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে গভীরতর তাৎপর্যের সংকেত :

'That corpse you planted last year in your garden,

Has it begun to sprout?...

Oh keep the Dog far hence…'

তরিবত মৃত হয়েও জীবিতদের পরিসরে ফিরে আসে কেন? বিশেষত গল্পকৃতির বিভিন্ন অনুপুঙ্খ থেকে বুঝতে পারি, ঘোর অশিক্ষা-কুসংস্কার দারিদ্র্যপীড়িত কোনও গ্রামে হঠাৎ-ই তরিবতকে উপলক্ষ করে বাস্তবের সব গ্রন্থি শিথিল হয়ে পড়েছে। কেন? যে-তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে গ্রামের স্থবির জীবনে, অলৌকিক ঘটনার জনশ্রুতি তৈরি হয়েছে– তা কি আসলে ওই গ্রামের পটভূমি ছাড়িয়ে সাম্প্রতিক বাংলাদেশকে ছুঁয়ে ফেলেছে? হাতুড়ে ডাক্তার জালালুদ্দিস, তাসাদ্দুক, খালেক মৌলবীদের গ্রামীণ কুসংস্কারকে ভিত্তি করে যে-গ্রন্থনা গড়ে উঠেছে, তা স্বভাবে ওয়ালীউল্লাহেরা গল্পবিশ্বের আত্মীয় বলে মনে হয় না। বরং লাতিন আমেরিকার যাদুবাস্তবতায় আধারিত ও লোকায়িত জীবনবীক্ষাপ্রসূত আখ্যানের কথাই যেন মনে আসে। জীবিতদের পরিসরে ফিরে-আসা মৃত তরিবতকে উপলক্ষ করে গ্রামে যে হুজুগ ও হৈচৈ চৈত্রসংক্রান্তির মেলার মতো তৈরি হয়েছে, তাতে কার্নিভালের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। কথকস্বর এরই চকিতে ভাষ্যকারের ভূমিকা নিয়েছে : 'ধীরে-ধীরে অশান্ত ঢেউয়ের মাথায় তরিবত স্থির হয়ে যায়। গ্রামের পর গ্রামে হাজার হাজার মানুষের চোখে তরিবতের বর্তমান অবস্থাটা বাস্তবের চেয়ে বড় বাস্তব। এমন বাস্তবতার তুলনা হয় না। চৈত্র মাসের গোঁয়ার রোদের মতোই খোলামেলা, প্রকাশ্য, বেপরোয়া। বর্তমান হটিয়ে দেয় তরিবতের অতীতকে। তবু তার মৃত্যুর ঘটনা মানুষের কাছে অর্থহীন হয়ে যায় না, বরং অতীত ঘটনাই তিলে তিলে গড়ে তোলে জীবিত তরিবতকে। কবরের ঘাস, মাটি, শেকড়বাকড়ের জঞ্জাল ফুঁড়ে তরিবতকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে দেখে তারা। কেবল চোখের সামনেই না, দৃষ্টির আড়ালেও তরিবত থেকে যায়। নিদ্রায়, জাগরণে, স্বপ্নে মুহুর্মুহু তরিবত ভর করে। ঘুমের ভেতরে স্বপ্ন হয়ে আসে তরিবত।' এই বয়ানে যে কাহিনীর বা বিবরণের নয়, এ সম্পর্কে সংশয় নেই কোনও। এই বাচন চিহ্নায়নের উপযোগী। এই গল্পকৃতি কেবল 'মরা মানুষের জ্যান্ত মুখ' দেখার কথকতা নয়; গল্পকার সুকৌশলে গ্রামীণ শ্রেণিদ্বন্দ্বের কিছু কিছু উপদানও এত জুড়ে দিয়েছে। 'এ গ্রামে, অন্য গ্রাম স্বপ্নে তরিবতের দেখা পাওয়া মানুষের সংখ্যা বাড়ে, বাড়তে থাকে'ও ইঙ্গিতপূর্ণ। গ্যাব্রিয়েল গ্যার্সিয়া মার্কেজের 'সরলা ইরেন্দিরা' ও শতবর্ষব্যাপী নিঃসঙ্গতা'র অনুরূপ মনে পড়ে যায়। লক্ষণীয় এই আদ্যন্ত চিহ্নায়িত বাচন : 'ঘুমের অন্ধকারে মানুষের সঙ্গে তরিবতের এই যোগাযোগ দুর্দান্ত কোলাহলের রূপ ধরে যতই

দিনের তেজি সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফাটে, মানুষগুলো ভেতরে ভেতরে কাবু হতে থাকে। আসলে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পৌরসমাজের ক্ষয়-পাণ্ডুর পরিস্থিতিতে জীবিতজনেরা যেন মৃতদের দ্বারা আক্রান্ত।

এই রূপকাশ্রমিতা (যেখানে একটি নিঃসাড় গ্রাম সমগ্র দেশের প্রতীকী প্রতিনিধি) স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে বয়ানের পরবর্তী অংশে :'... গ্রামটা আগের মতো নেই, মানুষগুলোও। থমথমে পরিবেশে বাতাস চলাচলও যেন বন্ধ। সামনে কি ঘটবে, কেউ জানে না। প্রথম কয়েক দিনের উত্তেজনা, কৌতূহলে তালগোল পাকানো মনের অবস্থায় চমকটাই ছিল বড়। ফিরে তাকানোর শক্তি, সাহস কারো ছিল না। এখন? কোথায় নিয়ে যাবে তরিবত? দিনে দিনে ভয়টা পাথর হয়ে চেপে বসেছে। এতদূর এসে তরিবতকে ফেরাবে এমন সামর্থ্য কারো নেই। তরিবত যদি চেনাজানা জগতটাকে পাল্টে আজগুবি কিছু বসিয়ে দেয়, নিজেদের প্রতিক্রিয়া তখন কেমন হবে?'

পড়তে-পড়তে খটকা লাগে, ষোল বছর আগে কবর দেয়া এই মৃত তরিবত কি আদৌ কোনও ব্যক্তি? নাকি মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী রাজাকার ও ধর্মান্ধ মৌলবাদী শক্তির সম্মিলিত রূপ যা বাংলাদেশের চেনাজানা জগৎটা পাল্টে দিয়ে ইতিহাসের গতিকে উল্টোদিকে ফেরাতে চাইছে? তাই বাংলার পৌরসমাজে মুক্ত হাওয়ার চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে। ফিরে তাকানোর শক্তি ও সাহসে দেখা যাচ্ছে ভাটার টান। যত দিন যাচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী অপশক্তির প্রতীক 'তরিবত গ্রাস করে গ্রামের পর গ্রাম। মানুষগুলো প্রাণহীন ঝিম ধরা। চোখের দৃষ্টিতে ভয়। ঘুমের ভেতর ভয়, জেগে ওঠার মুহূর্তে ভয়। মাঝদুপুরে নিজেদের গুটিসুটি ছায়া দেখে ভয়, হাতের পাঁচ আঙুলকেও ভয়।' লক্ষ্যভেদী এই চিহ্নায়িত বাচন।

মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী অপশক্তির প্রতিনিধি তরিবতের বিদূষণক্রিয়া জনগণের হস্তক্ষেপ স্তব্ধ হয়ে যায়। গল্পকৃতির সেই তুঙ্গ মুহূর্তে ওয়াসি বুঝিয়ে দেন, আদপেই এর সামর্থ্য বেশি ছিল না; ভীরুজনের মান্যতাই একে পিশাচ-প্রতিম করে তুলেছিল। তাই তো সমাপ্তিহীন উপসংহারে দেখতে পাই : 'পরদিন মানুষজন যার যার ঘরে জেগে ওঠে বিকট দুর্গন্ধে। গলপচা গন্ধটা এতই জোরলো, মনে হয় গোটা গ্রামটাই ভাগাড়।...রোদ চড়তে থাকলে দুর্গন্ধটা তেমন জোরালো থাকে না।...তরিবাতের ফোলা-ফাঁপা লাশটা বিশাল।...ষোল বছরের লাশ, দুর্গন্ধ হবে জানা কথা।' গল্পভাষার সূক্ষ্ম প্রয়োগে 'জেগে ওঠে', 'রোদ চড়তে থাকলে' হয়ে উঠেছে ইঙ্গিতগর্ভ। তেমনই লক্ষ করতে হয়, জনপদে ত্রাস তৈরি করতে সক্ষম তরিবত এখন 'ফোলা-ফাঁপা লাশ' মাত্র : ষোল বছর পরে তার পুনরাবির্ভাব দুর্গন্ধ ছড়াবেই। কিন্তু জাগ্রত ও তৎপর জনতা পচাগলা ওই লাশকে ভদ্রস্থ কবরও দেবে না, ছুড়ে দেবে গর্তে। তারপর চাঙড়ের পর

চাঙড় মাটি ফেলে চিরকালের মতো তার প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ করে দেবে। গভীর রাজনৈতিক অন্তঃস্বরসম্পন্ন রূপকের বাস্তবতার এমন নির্মাণ সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পে দুর্লভ।

॥ চার ॥

প্রকৃতপক্ষে ওয়াসি আহমেদের প্রায় প্রতিটি ছোটগল্পেই লক্ষ করি উপস্থাপনার ভিন্ন ভিন্ন রীতি। এই রীতি তাঁকে খুঁজতে হয় না খুব একটা, তাঁর প্রখর পর্যবেক্ষণ, বহুবর্গে বিভক্ত সাম্প্রতিক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বিশিষ্ট প্রেক্ষণবিন্দুর সমন্বয়ে স্বতশ্চলভাবেই গড়ে ওঠে। 'গর্ত সন্ধান' গল্পটি শুরু হয় ম্যানহোলের ঢাকনিচুরির প্রসঙ্গে। তারপর অজস্র অনুপঙ্খ-গ্রন্থানার মধ্য দিয়ে শ্রেণি-বাস্তবতায় রুদ্ধ মানুষজনের নিষ্ঠুরতা-অগভীরতা-হুজুগপ্রিয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই প্রেক্ষিতে কখন যেন অবান্তর হয়ে যায় আবদুল করিম নামের গোয়ালার প্রতি ধারাবাহিক অমানুষিক নির্যাতন। নাগরিক মধ্যবিত্তদের জীবন-যাপান ও আচরণে ঘুলিয়ে ওঠা অন্ধকারই গল্পকারের বিবরণ ও গল্প নির্মাণের অন্বিষ্ট। গল্পকৃতির অন্তিম অংশে ওয়াসি উপস্থাপনার সূক্ষ্মতায় সভ্যতার কদর্য অমানবিক দিকটা উদঘটিত করেন। জীবিত বা জীবন্মৃত আবদুল করিমকে যখন লোকজন ঘাড়ে করে এক ম্যানহোল থেকে অন্য ম্যানহোলে বয়ে বেড়ায় তারা তখন টের পায় ওজনটা বাড়ছে, এ কিসের ওজন? তাদের নিজেদের যৌথ অপরাধবোধ (collective guilt)– কথাটা লেখক ভেঙে বলে না দিলেও অভিনিবেশি পাঠকের ধরতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

অন্যদিকে 'নাগাল' গল্পে আনোয়ারের মৃত্যু-এষণা গল্পকারের উল্লেখযোগ্য গল্প। মনস্তত্ত্বের চমৎকার ব্যবহার আর অনুপুঙ্খের গ্রন্থনা ছাড়াও পাঠক লক্ষ করেন স্বপ্নহীন জীবনে স্বপ্ন ফিরিয়ে আনার প্রতীকী ক্রিয়াকে। 'লোকমান হাকিমের স্বপ্নদর্শন' গল্পে লোকমান হাকিম ও তার স্ত্রী বিলকিসের সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বপ্নসঙ্কট তৈরি করে আবার সেই স্বপ্নের সূত্রেই নিঃশব্দে তাদের ভূমিকার বদল হয়ে যায়। এতে ওয়াসির বৈচিত্র-সন্ধান ব্যক্ত হয় না শুধু, মনে হয় তিনি যেন ভেতরে-ভেতরে নিজের গল্প ভাবনায়ও ভাঙচুর করতে চাইছেন। এত কাহিনীর গুরুত্ব কম, উপস্থাপনার বিশিষ্টতাই সবকিছু।

'চক্রবৃদ্ধি' বন্ধ্যা সময়ের আরেকটি সার্থক গল্পকৃতি। একদিকে রাজনীতিহীন রাজনীতির ভড়ং কিংবা বিভ্রান্তিজনিত মানবিক অপচয় এবং অন্যদিকে অভ্যাস-জর্জরিত মধ্যবিত্তবর্গের ভীরুতা : এরই মধ্য দিয়ে সময়ের কনাগলিতে নির্মিত হয় নরকের কথকতা। মধু-বাচ্চু-রাজা যেন তিক্ত অসহিষ্ণুতা ও মূর্খ সন্ত্রাস-কবলিত বিপন্ন সময়ে ভাসমার তিনটি বুদ্বুদ। গল্প-নামে নিহিত সংকেতর তাৎপর্য বুঝতে পারি সমাপ্তি-সূচক অনুচ্ছেদে। বন্ধ্যা সময়ে ভাসমান অজস্র বুদ্বুদের সমাবেশে হারিয়ে যায় সমস্ত প্রতিবাদ ও

প্রতিরোধ। এমনকী, সেইসব রূপান্তরিত হয় কার্নিভালে আর এরই অমোঘ অভিঘাতে অভ্যস্ত রাজনৈতিক প্রকরণগুলিও (মিছিল-সভার আয়োজন-বক্তৃতা) চূড়ান্ত হাস্যকর হয়ে যায়। গল্পকারের বিবরণও এই নিরিখে মনোযোগ আর্কষণ করে; 'এই লোকগুলো মোটেও বক্তৃতা শুনতে এসেছে বলে মনে হয় না। অফিস-ফেরত কেরানী-কেরানী চেহারা, কারো কারো হাতে খালি টিফিন বক্স, প্লাস্টিকের সস্তা ফ্লাক্স। পান মুখে, বাদাম চিবুতে চিবুতে, নয়ত শুধু শুধু মেয়েমানুষের বক্তৃতা খাবে বলে মুখে ছোট হাঁ মেলে দাঁড়িয়ে আছে।...এদিকে মহিলা ফোরামের অনশন প্রস্তাবের ফিরিস্তি চলছে তো চলেছে। চল্লিশ ছোঁয়া যে মহিলা ফুলস্কেপ কাগজের তাড়া থেকে পড়ে শোনাচ্ছে, তার গলাটা আহ্লাদি। বক্তৃতাবাজির গলা নয়, রীতিমত দুধেভাতে গড়া। একেকটা কথা মুখ থেকে রেরুতে না বেরুতে আদুরে বিড়াল-বাচ্চার মতো লুটোপুটি খাচ্ছে। কয়েকটা কথা আধো-আধো বোলের মতো রাজার কানে ঢুকল। মহিলার 'র' সমস্যা। আমরাকে বলছে আমড়া। বারবার আমড়া-আমড়া শুনে রাজা ভাবল, সামনের লোকগুলো নির্ঘাত ধরে নিয়েছে, তাদের জনপ্রতি একটা করে আমড়া দেয়া হবে।' নিঃসন্দেহে এই শ্লেষতিক্ত বাচনাভঙ্গিতে নিহিত রয়েছে যথাপ্রাপ্ত বাস্তব সম্পর্কে গল্পকারের সমালোচনা।

'তীরভূমি' নামক গল্পের গল্পকৃতিও বহুস্বরিক। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বাস্তবে মার্কিনমুলুক-লন্ডন-অস্ট্রেলিয়া-কানাডা যেন হ্যামলিনের বাঁশি বাজিয়েই চলছে। আর, সেই বাঁশির জাদুতে আকৃষ্ট হয়ে হাজার-হাজার মানুষ স্বেচ্ছায় উৎখাত হয়ে যাচ্ছে নিজেদের জমি ও ঐতিহ্য থেকে। ডলার-পাউন্ডের অদম্য লোভে আচ্ছন্ন হয়ে ওরা ভুলে যাচ্ছে নিজস্ব তীরভূমি; এদের আর ঘর থাকছে না, থাকছে কেবল তাঁবু অন্তরে-বাহিরে। এই যে ডায়াস্পোরার নতুন বাস্তব, এর অন্তর্বৃত ট্র্যাজেডিকে আশারাফ আলীর পরিবারের সূত্রে খনন করেছেন গল্পকার। এই আশরাফ যতখানি ভোগবাদী বিশ্বায়নের মায়ায় মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত বাংলাদেশের প্রতীকী প্রতিনিধি, ততখানি শিকড়-বিচ্যুত তৃতীয় বিশ্বেরও। চিহ্নায়িত গল্পভাষায় কুশলী গল্পকার নব্যবাস্তুহীনদের এই বাস্তবকে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন : 'আট-বাই-দশ বসার ঘরে রঙচটা বেতের চেয়ার জানালার ভাঙা কাঁচ-ঢাকা জুহি চাওলার তেলতেলে মুখ, দেয়াল জুড়ে পেরেকের খানখন্দ, ইউনানি দাওয়াখানার ক্যালেন্ডার আর এসবের মাঝখানে হোয়াইট হাউজের বিল ক্লিন্টন, লস্ এঞ্জেলেসের পিলপিল গাড়ি, ল্যারী কিং লাইভ একে একে ঘরের আনাচে কানাচে জায়গা নিয়ে নিলে আচমকা ধাক্কা লাগে বৈকি! তবে ধীর ধীর অগোছালো স্বপ্নের মতো একটা মৌতাতও দানা বাঁধে।' এই যে অগোছাল স্বপ্নের মৌতাত, তা বাংলাদেশেসহ তৃতীয় বিশ্বের স্বেচ্ছায় ছিন্নমূল হওয়া মানুষজনের চিত্তের উপনিবেশীকরণ প্রক্রিয়ারই পরিনতি। আশরাফ আলীর পরিবারের সদস্যদের মতো

তীরভূমিহীন ভাসমান মানুষেরা মনের দিক দিয়ে মার্কিনীভূত হয়ে গেছে। জাতীয়তা-সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি ধারণা সমস্ত প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে ফ্লোরিডা বীচে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আসা ঝাঁকে ঝাঁকে কিউবার শরণার্থীদের টিভির পর্দায় দেখতে পেয়ে এই আত্মবিস্মৃত নব্যশরণার্থীদের মনে কোনও মানবিক প্রতিক্রিয়া হয় না। কেননা তাদের মধ্যে কোনও আত্মজিজ্ঞাসা নেই। সাম্প্রতিক ডায়াসপোরার এই অমোঘ বাস্তবই গল্পকারের উপজীব্য। আশরাফের পরিবারের অন্য সদস্যদের প্রতিক্রিয়াও লক্ষ করার মতো। কিন্তু ওয়াসি তাঁর গল্পকৃতিকে নেতি ও অপচয়ের শূন্যতায় হারিয়ে যেতে দেননি। তাই টিভির পর্দায় কিউবার উদ্বাস্তু যুবতীর প্রতি রক্ষীর নির্মম আচরণ আশরাফ আলীর মধ্যে সহমর্মিতার বোধ জাগিয়ে দেয়। বুঝে নিই, চারদিকে ব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যেও মানুষ্যত্ব মরে না। আর, এখানেই গল্পত্ব।

'পঁচিশ বছর' নামক গল্পে গঙ্গাদাশ ও রেণুবালার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বাংলাদেশেরই অস্বস্তিকর অপর বাস্তব যেখানে ধার্মান্ধ জুহ্লাদের কাছে বিপন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন, সংস্কৃতি, মর্যাদা ও সম্পত্তি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তনি সেনাদের হত্যার তাণ্ডব ও ওই জুহ্লাদদের তৎপরতা যে নারকীয় পরিবেশ তৈরি করেছিল, তাকেই গল্পকৃতিতে রূপান্তরিত করেছেন ওয়াসি। তাঁর রচনা-নৈপুণ্য রেণুবালা হয়ে ওঠে ত্রস্ত ও বিপন্ন বাংলাদেশেরই প্রতিনিধি, যাকে পঁচিশ বছর পরে নতুন তাৎপর্যে আবিষ্কার করে গঙ্গাদাশ এবং আবিষ্কার করেন পাঠকও।

॥ পাঁচ ॥

তেপন্তরের সাঁকো সংকলনের 'খাঁচা ও অচিন পাখি'র কথকতার শৈলী ও সুলেমানের উপস্থাপানা বুঝিয়ে দেয় ওয়াসি শ্লেষ-গর্ভ বয়ান রচনার একটি নতুন পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন। বিকলাঙ্গ মুক্তিযোদ্ধা সুলেমান তার নিজের মতো করে রাষ্ট্রের প্রসাধন-ক্রিয়ার আড়ম্বরের বিরুদ্ধে নিজস্ব প্রতিক্রয়া ব্যক্ত করে যেন। যে-সার্বিক পচনক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক দর্শনীয় বস্তুতে রূপান্তরিত হয়েছে, সুলেমান তাকেই একান্ত নিজস্ব কার্নিভালে বিদ্ধ করতে চায়। বস্তুত স্বয়ং গল্পকার তাঁর প্রতিবেদনে ভাষায় হুল ফুটিয়েছেন : 'বছরের পর বছর কত আর! একই খেলা। উপভোগের উপকরণগুলো ব্যবহারে-ব্যবহারে ক্লিশে। আর এতদিনে সুলেমান জানে, বানরের খেলা মজাদার হলেও বানরের কোনো আয়-উন্নতি নেই। আজকাল হঠাৎ হঠাৎ সুলেমান ডুগডুগির আওয়াজ শুনতে পায়। ভরদুপুরে কাকপক্ষীর রা নেই, গরমে ঘর-বাড়ির ছাদ, জানালার কাচ পুড়ছে, তারই ভেতর আচমকা কানে আসে ডুগ্‌ডুগ্‌ডুগ্‌।' কে এই অদৃশ্য বাজিকর? বিশ্বপুঁজির মোড়ল নাকি উগ্রধর্মতন্ত্র অথবা এই দুইয়ের সম্মিলিত শক্তি? ধারাবাহিক ক্ষয় ও আত্মবিনাশের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র যেহেতু খাঁচায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

পুরোপুরি অবান্তর এবং আবেগ-উসকে দেওয়ার পণ্য মাত্র। সুতারং মুক্তিযোদ্ধারা তো 'অচিন পাখি' হবেই। পুনর্বাসন কেন্দ্রে আশ্রিত মুক্তিযোদ্ধারা রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বজ-দণ্ড বাহকদের কাছে দুর্বোধ্য, অচিন পাখি তো বটেই।

'সরকার স্বয়ং সতর্ক পাহারায় পুনর্বাসন কেন্দ্রটির দেখভাল করে আসছে। এটা একটা প্রায়োরিট সেক্টার।...সরকার না দেখলে এসব কেন্দ্রের বাসিন্দাদের কে দেখবে! এরা খাস জাতীয় সম্পদ'। এক হাত ও এক পা ওয়ালা সুলেমান 'জাতীয় সম্পদ' কীভাবে, তা বয়ানের পরবর্তী অংশের প্রলম্বিত ক্যারিকেচারে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়েছেন গল্পকার। ক্রমশ বাস্তব সম্পৃক্ত হয়ে যায় অধিবাস্তবে; মুক্তিযুদ্ধের শহিদ হাবিলদার জামাল সুলেমানের তাৎপর্যহীন বাস্তবে নেমে এসে 'আলো-অন্ধকারের ওপারে এক গাঢ়-গভীর-অর্থে ঘোর'-এর দিকে টেনে নিয়ে যায়। তখন গল্পকৃতিতে ঘটনা ও ঘটনাহীনতার ব্যবধান লুপ্ত হয়, বিবরণ ও পরা-বিবরণ একাকার হয়ে যায়। কিন্তু এটাই উপযুক্ত মুহূর্ত বয়ানের অন্বিষ্ট স্পষ্ট করার জন্যে। 'টানা কবরবাসের ক্লান্তি একঘোয়েমির কথা' তো একা জামালের নয়, তা আসলে বিভ্রান্ত বাংলাদেশের সামূহিক আর্ত উচ্চারণ। 'বাইরের পৃথিবীর মুক্ত স্বাধীন আলো-বাতাসের স্বাদ পেল না বলে আক্ষেপে, হতাশায় মাথা ঠোকে' তো মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বিলীয়মান প্রজন্ম। বিকলাঙ্গ এখন সমস্ত পৌরসমাজ। 'স্বাধীন বাতাসের ফুরফুরে সুগন্ধ নাকভরে' টানার স্বপ্ন দেখেই ওদের সময় কাটে। বাংলাদেশ এখন দেশপ্রেমিকদের কাছে একটা খাঁচা : 'খাঁচাটা বৃষ্টিতে ভেজে, রোদে শুকোয়, হাওয়ায় টানে মৃদুমন্দ দোলে। খাঁচা থেকে তাকে কেউ টেনে বের করছে না বা চাইলেও পারছে না– খাঁচার ঘেরটা টলোমলো, যেন-বা পারদের। হাত ছোঁয়াতে ভয়,ভয়।'

ওয়াসি কেন অপ্রতিরোধ্য কথাকার, তা তাঁর গল্পভাষায় সূক্ষ্মতায় ও স্বাতন্ত্র্যে ব্যক্ত হয়। পাঠকের নজরে পড়ে 'ঝিমিয়ে-পড়া কেন্দ্রের ঘুপচি-ঘরে দীর্ঘ, তালগোল-পাকানো ঝিমুনিতে সুলেমান এই ডোবে, এই ভাসে' কিংবা 'ব্যলকনির ওপর নারকেল গাছের ঢালু পাতায় পিণ্ড-পিণ্ড রোদ ঝলমলে বেলুন হয়ে ফুলছে।' এই গল্পের শেষে আছে দুর্গন্ধের প্রসঙ্গ। রাষ্ট্র, ইতিহাস ঐতিহ্য, বিশ্বাস, পৌরসমাজ, রাজনৈতিক সমাজ সমস্তই যখন দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে পচে যেতে থাকে, দুর্গন্ধ ছড়ায় সর্বত্র। তাই তো ওয়াসির বিভন্ন গল্পকৃতিতে ফিরে-ফিরে আসে এ প্রসঙ্গ, যেন নানা অনুষঙ্গে মনে করিয়ে দেন 'হ্যামলেট' নাটকের সেই প্রবাদ-প্রতিম উচ্চারণ "Something is rotten in the state of Denmark" এই জন্যে 'অচিন পখি' সুলেমান হয়ে যায় আউটসাইডার এবং বাস্তব ও অধিবাস্তাবের সীমারেখাকে ঝপসা করে দিয়ে বয়ানের সমাপ্তিতে শুরু হয় তার সমাপ্তিবিহীন অলৌকিক দৌড়। খাঁচার বাইরে যাওয়ার জন্য তাঁর এই এক পায়ে

ছোটা স্পষ্টভাবেই প্রতীকী ক্রিয়া। আগেই লিখেছি, গল্পকার অবসানে বিশ্বাস করেন না; তাই বাস্তব পেরিয়ে গেলেও তিনি নতুন আরেক আরম্ভের ইশারা করতে চেয়েছেন।

'মেঘসাঁতার'-এর বিচিত্র গল্পবস্তু ও নির্মাণকলা ভিন্নস্বাদ নিয়ে এসেছে পাঠকের জন্যে। এ যেন জীবনানন্দের বিখ্যাত কবিতা 'আট বছর আগের একদিন'-এর স্বাধীন গদ্যভাষ্য। বেসরকারি একটি ফার্মে বেশ কছর ধরে কাজ করে আসা যে-কোনও একটি মানুষ (প্রথম পরুষ সর্বনামের নির্বিশেষ অভিজ্ঞানের বাইরে যার কোনও স্বতন্ত্র পরিচয় নেই) গল্পকৃতির অবলম্বন। একঘেয়েমির অবসাদে, অনন্বয়ে ও বিচ্ছিন্নতাবোধে তার জীবন নিঃস্বাদ। জীবনানন্দ লিখেছিলেন :

'নারীর হৃদয়– প্রেম-শিশু-গৃহ-নয় সবখানি;

অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়–

আরও এক বিপন্ন বিস্ময়

আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে

খেলা করে;

আমাদে ক্লান্ত করে–

ক্লান্ত– ক্লান্ত করে।'

তাই জীবনানন্দের কবিতার মানুষটি অশ্বত্থের কাছে একগাছা দড়ি হাতে নিয়ে গিয়েছিল আত্মহত্যার জন্যে। আর, ওয়াসির গল্পে নাগরিক মানুষটি পুনরাবৃত্তিময় জীবনের শ্বাসরোধক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে একরাতে বিছানায় শোয়া স্ত্রীর পাশ থেকে উঠে এসে, যেন একটা ঘোরের মধ্যে, ছ'তলা বাড়ির ছাদ থেকে আকাশ উড়তে-থাকা হাতির মতো মেঘের শুড়ের উদ্দেশে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অন্তিম অনুচ্ছেদের প্রারম্ভিক দু'টি বাক্য এরকম : 'সে ক্লান্ত' হতে লাগল। এবং ক্লান্ত হতে হতে, ক্লান্ত হতে হতে... একরাতে গা শিউরানো অনুভূতিতে জেগে উঠল।' এই জেগে উঠা বস্তুত আর কোনও দিন জেগে না-উঠার জন্যে। এ কি মনোবিকারের গল্প না কি গূঢ় আস্তিত্বিক যন্ত্রণার কথকতা? জীবনানন্দীয় অনুষঙ্গ লিখতে পারি : 'তবু সে দেখিল / কোন ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার?

ওয়াসি জানেন সব প্রশ্নের মীমাংসা হয় না।

॥ ছয় ॥

গল্পকারের আশ্চর্য লিখনশক্তির চমৎকার প্রমাণ হিসেবে গণ্য তাঁর বহুল আলোচিত 'শেরশাহ ও তার অমোঘ পরিণতি' নামক গল্পটি। শেরশাহ একটি স্বাস্থ্যবান ষাঁড়ের নাম। তার শুক্রবীজ দিয়ে কৃত্রিম প্রজনন করানোর ব্যাপারটি যেভাবে বহুমাত্রিক হয়ে উঠেছে, তা আমাদের বিস্মত করেছে। গল্পকৃতির শেষ পর্যন্ত না-পৌঁছে বোঝা সম্ভব নয়, কীভাবে এরকম একটি বিষয় সাম্প্রতিক বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি চিহ্নায়ক হয়ে উঠেছে। অন্তিম পর্যায়ে যখন বদরুর ভাবনার অন্তরালে কথকস্বর সোচ্চার হয়ে ওঠে, কেবলমাত্র তখনই বুঝতে পারি, গল্পকার কী আশ্চর্য ছোটগল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন : 'শেরশাহ তুমুল সম্ভাবনার জন্ম দিয়েছিল, সম্ভাবনাটুকু টিকল না– স্বপ্নে পাওয়া বলেই? শুধু স্বপ্নে ভর করে তো বড়ো বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলা যায় না? নাকি স্বপ্ন ও বাস্তবের গোঁজামিলের কারণেই বিপ্লবটা ফেঁসে গেল?' শেরশাহকে যারা খোলা ময়দানে হত্যা করে, ওরা কারা– এই প্রশ্নের জবাব পাঠককেই খুঁজে নিতে হয়।

কেন বাংলাদেশ নামক স্বপ্ন তার জন্ম-মুহূর্তে ও কিশোর বেলার এত বলবান ছিল, কেনই বা হঠাৎই তা হয়ে গেল অকাল-ব্যাধিতে আক্রান্ত ও জীবনীশক্তির অভাবে ম্রিয়মাণ– এর গভীরতর তাৎপর্য পাঠক নিজেই খুঁজে নিতে পারেন। হতদরিদ্র বদরু তো আসলে বাংলাদেশের অন্তেবাসী বর্গের প্রতিনিধি যার ছিল একান্ত নিজস্ব এক খোয়াবনামা। নিম্নবর্গীয় জীবনের উপযোগী কল্পনা কখনও উচ্চবর্গীয় ভাবনাবিশ্বের অনুসারী হতে পারে না– ওয়াসি এই মৌলিক ও সূক্ষ্ম শিল্প-সত্য মনে রেখেছিলেন। তাই শেরশাহ নামক ষাঁড়কে উপলক্ষ করে কাহিনীর যে-আদল তৈরি হয়, তা হয়ত সংস্কৃতি-অভিমানী মধ্যবর্গীয় পাঠকজনেরা ভবতেই পারতেন না। তবে, একটু আগে যে-কথা লিখেছি, গল্পকার চিহ্নায়িত উপসংহারে পৌঁছানোর প্রস্তুতি বয়ানের মধ্যেই আভাসে জানিয়ে দিয়েছেন : 'বদরু এতটাই আলাদা– স্বপ্ন ও বাস্তবকে একাকার মিশেয়ে ফেলার ক্ষমতা রাখে... ।' স্বপ্ন ও বাস্তবকে মিশিয়ে ফেললেও স্বপ্নটা একধাপ বেশি স্বপ্ন, বাস্তবের টানপোড়েন সত্ত্বের স্বপ্নটাই বশি শক্তিধর। স্বপ্ন ও বাস্তবের এই সংমিশ্রণের প্রক্রিয়ায় অনেকখানি বদলে যায় বদরু, বদলে যায় আদিনা। ক্রমশ কথকস্বর জানায়, 'কিন্তু স্বপ্ন থেকে যে ঘটনার শুরু তার ব্যাখ্যা যত চমকপ্রদই হোক, স্বপ্নজাত বলেই যেন বাস্তবের সঙ্গে তাকে একাকার করে ফেলা সহজ হয়ে ওঠে না।' আর, তাই, চিহ্নায়কের সঙ্গে চিহ্নায়িতও অবরোহণের পথে বিনষ্ট হওয়ার দিকে যাত্রা করে।

নতুন নতুন বিষয় মানেই নতুন নতুন আঙ্গিক আর গল্পভাষার নতুন উদ্ভাসন। 'ডলফিন গলির কুকুরবাহিনী' ও 'অপুর ধর্ম টিচার' এমনি দু'টি গল্পকৃতি। শেষোক্ত গল্পে ওয়াসি অনন্বয়-ক্লিষ্ট সাম্প্রতিক সমাজে বহুমেরু-বিষম অস্তিত্বের দুরূহ জটিলতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। বোঝাই যাচ্ছে, খুব সচেতনভাবে গল্পকার এই প্রজন্মের শিশুদের ওপরে মৌলবাদ ও আধুনিকোত্তরকালের উদ্ভট সহাবস্থানের প্রতিক্রিয়া নিয়ে ভেবেছেন। কম্পিউটার ফার্ম, সফটওয়ার প্যাকেজ, মাইক্রোসফট, ভার্চুয়াল রিয়েলিট ইত্যাদি প্রযুক্তিসম্পৃক্ত পরিভাষার ব্যবহারে যেন এই সংকেত দ্যোতিত হয়েছে যে, একালের শিল্পভাষা আর আগের মতো নেই। তাহলে কমরান-রিয়া-অপু-- এরাই-বা কীভাবে অন্যরকম না হয়ে থাকতে পারে? এসেছে সাইবারস্পেস, ইন্টারনেট এবং ইতিহাস ও মানবিকতার অবসান-প্রসঙ্গও। সাত বছরের অপু কেন মুনিয়া পাখিকে মেরে ফেলে? কী দেখতে চায় সে? তাতে ধর্ম-শিক্ষকের বক্তব্য কোন অজ্ঞাতপূর্ব জটিলতার জন্ম দেয়?

'স্মৃতিস্তম্ভ কিংবা এলেমানের লেজ' ওয়াসির আরেকটি আশ্চর্য গল্প যেখানে বিবরণকে আবছা করে দিয়ে ভেতর থেকে জেগে উঠেছে পরা-বিবরণের দ্যুতি। শিল্প-কৌশলের চমৎকার প্রয়োগে এই গল্পকৃতি শ্বাণিততর। ভাষার প্রবাহে ভেসে যেতে-যেতে পাঠক এই প্রশ্ন করতে ভুলে যান, এলেমান আসলে কে, কিংবা বলা ভালো, কী? কেন বায়ানের শুরুতে রূপকথার ধরন : 'এক ছিল এলেমান, তার ছিল এক লেজে।' কেনই বা তার অদৃশ্য লেজ নিয়ে এত কথা? কেনই বা বর্তমান থেকে অতীত ফিরে যায় কথক স্বর : 'এসব তো অনেককাল আগের কথা'। কেন লোকনিরুক্তিতে এলেমান হয়ে ওঠে শহিদ মুক্তিযোদ্ধা এবং তার প্রসঙ্গ কেন রাজনৈতিক চাতুর্যের সহজ খাদ্য। পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে, বয়ানের শেষ দিকে হঠাৎ-ই কেন ভাসাজ গ্রন্থনার মেজাজ পালটে যায় : 'এলেমান নামটাও যেন যাদু জানে। সাধারণ, গড়পড়তা নাম এ নয়, অসাধারণ বললেও বলা হয় না– অনুভূতিতে রহস্যের বুদ্বুদ ফোটে না। অবস্থাটা যেন, রূপকথার রহস্যপূরী থেকে ছিটকে বেরিয়ে মানুষের বোধবুদ্ধির শৃঙ্খলাকে সে এলোমেলো করে দিয়েছে।'

হ্যাঁ, এলেমান অনেক কিছুর সংশ্লেষণে লোকমনে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু গল্পকৃতির প্রয়োজনে ওয়াসি নিজস্ব বয়ান বাছাই করে নিয়েছেন যা স্রষ্টাকে করতেই হয়। এই বাছাইয়ের সূত্রের প্রধান স্বরকে জোরালো করার জন্যে প্রতিবেদনের প্রতীকিতাকেও বিশেষ বিশেষ সহায়ক উপাদান দিয়ে বিশ্বাস্য করে তুলেছেন। এলমানের স্মৃতি বহুস্বরিক। একই সঙ্গে তা মুক্তিযুদ্ধ ও তার মৃত্যুঞ্জয় বীর নায়কের স্মৃতি– সাম্প্রতিক বাংলাদেশে যা অনাদরে অবহেলায় ধূসর হয়ে গেছে। তাই কথকের কণ্ঠে ওয়াসি লিখেছেন

:‘আমরা আমাদের মতো বড় হতে লাগালাম। আমাদের ছোট শহরটা কিন্তু আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠল না। সেটা যেন দিনদিন ছোট থেকে ছোট হতে থাকল। যে-শহরকে নিয়ে এককালে আমাদের খুব গর্ব হত, সে-শহর চাপা পথ-ঘাট, ঘিঞ্জি দোকান-পাট, নোনাধরা বাড়ি-ঘর, হাড়সর্বস্ব পিলপিল মানুষজন দেখে দেখে আমরা দমে যেতে লাগলাম। শহরে মানুষ বেড়েছে কাজ বাড়েনি, খাওয়ার এত মুখ, খাবার নেই। আমদের কেউ কেউ অন্য শহরে পাড়ি জমাল, অনেকে তা করতে না পেরে কুৎসিত ভাষায় শহরটাকে গালমন্দ করে দিন গোজরান করতে লাগল।’

॥ সাত ॥

জাঁ বদ্রিলার আমাদের চিহ্নের রাজনৈতিক অর্থনীতির কথা জানিয়েছেন। আর, ওয়াসি আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, ছোটগল্পও সময়ের সূক্ষ্ম প্রতীকী সন্দর্ভ হয়ে উঠতে পারে একই ঘরনার। ‘বেড়ে ওঠার ঝোঁকে অনেক কিছুর মতো এলেমানকে পেছনে ফেলে এসেছিলাম। ... কিন্তু আসলে এলেমান যে এ শহরের মানুষের ঘুমন্ত স্মৃতিতে টানা ঘুম দিতে দিতে হঠাৎ জেগে ওঠার অপেক্ষায় দিন গুনছিল’– বহুস্বরিক এই বাচনের তাৎপর্য বোঝার জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের ইতিহাস মাথায় না এনে উপায় নেই। সেই সঙ্গে নাতিপ্রচ্ছন্ন শ্লেষ সত্ত্বে ভাবতে হয় এ-কথাটা নিয়ে: ‘কোমরে গিঁট দিয়ে বাঁধা লেজটাই ছিল এলেমানের মূলশক্তি বা শক্তির মূল’। এই লেজ কী এবং কেন– এর জবাবও পাঠককেই খুঁজে নিতে হবে। এলেমানের বিস্মৃতি-পুনঃপ্রতিষ্ঠা-অবমূল্যায়ন– তিনটি স্তরই ইতিহাসে আধারিত এবং তাতে ‘লেজ’ প্রসঙ্গও গভীরভাবে চিহ্নায়িত : ‘অবস্থা দেখে মনে হল, এত এত বছর পর এলেমানের লেজ গিঁট খুলে সত্যি সত্যি ঝুলে পড়েছে। লেজটা আবার পাকানো দড়ির মতো মজবুত বলে ইচ্ছেমতো টানা-হ্যাঁচড়া করে যাচ্ছে। এলেমানও যেন মজা পেয়ে লেজটাকে নাচিয়ে চলছে। নিরানন্দ শহরে বিনোদন বলতে লেজ ধরে টানাটানি।’ এখানে শ্লেষ-উতরোল রাজনৈতিক স্যাটায়ারে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এলেমান ও তার লেজের বিবিধ লোক-ভাষ্যও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের পরিচিত কিছু অনুষঙ্গকে মনে করিয়ে দেয়।

ইতিহাসকে যারা হাইজ্যাক করে, তারাই তো কৃষ্টিনায়ককে জনসমক্ষে হেয় করে। তারই চিহ্নায়িত অভিব্যক্তি লক্ষ করি গল্পকৃতিতে : ‘কে বা কারা স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে একটা কুৎসিত কাকতাড়ুয়া ঝুলিয়ে গেছে। বেদিতে যেখানে গোলাপ রজনীগন্ধা থাকার কথা, সেখানে নাড়িভুঁড়ি খুবলানো মরা বেড়াল

ফেলে গেছে। উৎকট দুর্গন্ধে কাছ ঘোঁষা যাচ্ছে না। কৌতূহল নিয়ে যারাই ছুটে যাচ্ছে, চৌমাথার কাছাকাছি হতে না হাতে নাক-মুখ কুঁচকে পালিয়ে আসছে। বাকশক্তি হারিয়ে আমরা দূরে-দূরে ঘুরতে লাগলাম।' এখানেও পাচ্ছি ওয়াসির প্রিয় চিহ্নায়ক 'দুর্গন্ধ'-এর প্রয়োগ।

ছোটগল্পের শিল্প-শর্ত মেনে নিয়ে কীভাবে সার্থক রাজনৈতিক প্রতিবেদন নির্মাণ করতে হয়, তারই অসামান্য পাঠ দিয়েছেন যেন ওয়াসি । অন্তত এক্ষেত্রে তিনি যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, এ বিষয়ে সংশয় নেই কোনও। অন্তিম অনুচ্ছেদটি যেন শল্যচিকিৎসকের নির্মোহ ছুরির মতো বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক আবহকে ব্যবচ্ছেদ করেছ : 'অনেকদিন হয়ে গেছে। শহরের চৌমাথায় এলেমান স্মৃতিস্তম্ভ তেমনি আছে। তবে এর ব্যবহার বদলে গেছে। শহরবাসীরা দুই দলে ভাগাভাগি হয়ে রাতে ও দিনে দুইভাবে এক ব্যবহার করে। একদল রাতে আবর্জনা-বিষ্ঠা, কুকুর-বেড়াল, নিদেনপক্ষে ইঁদুর-ছুঁচোর গলা-পচা লাশ স্তূপ করে রাখে, দিনে অন্যদল ধূয়ে-মুছে ডেটল-ফিনাইল ছিটিয়ে ও গোলাপ রজনীগন্ধা জবা গাঁদা এসব চেনা এবং আরও অনেক নাম না জানা অচেনা ফুলে বেদিচত্বর আপাদমস্তক মুড়ে ফেলে।' বাংলাদেশের ও উপমহাদেশের সাম্প্রতিক রাজনীতির দিন-রাত্রির রূপকে এমন চমৎকার বিভাজন আমাদের নির্বাক করে দেয়। বস্তুত এমন একটি ছোটগল্প পড়ার পরে স্তব্ধতা যেন ঘনীভূত হয় আরও, নতুন গল্পকৃতি সম্পর্কে মনোযোগী হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

তবু 'আকাশমুখী' পড়তে-পড়তে পাঠক আবার নতুন করে বিহ্বল হতে পারেন। দুর্গন্ধ ওয়াসির প্রিয় চিহ্নায়ক। এই ছোটগল্পে তা বয়ানের মুখ্য অবলম্বন। নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত মিলি হয়ে উঠছে একাকী, নিঃসঙ্গ। গল্পকৃতির বেশ খানিকটা অংশ জুড়ে এর সানুপুঙ্খ বিবরণ পাচ্ছি। সাংসারিক ব্যাপারে যেহেতু মিলি যথেষ্ট বৈষয়িক, ভাবনা-চিন্তা ছাড়া কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছায় না, তার দুর্গন্ধে আক্রান্ত হওয়ার মতো কার্যকারণহীন উদ্ভট ঘটনা হারুনকেও উদ্বিগ্ন করে তোলে। ধীরে ধীরে গল্পকার এগিয়ে যান প্রতীকিতার গভীর অবতলে : 'দুর্গন্ধের সুনির্দিষ্ট উৎস নেই, বাস্তবিকই উৎসহীন, ঠিকানাহীন।... দুর্গন্ধের কোনও আলাদা বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব নেই। মানুষের জীবন, গোটা জীবজগৎ এর ওপর ভেসে আছে, আর ভেসে আছে বলেই চাপা দিয়ে আছে। –যে-কোনও সময় ভারসাম্য নষ্ট হয়ে ওলটপালট হয়ে যেতে পারে।' কোনও রকম ভাষার মারপ্যাঁচ ছাড়াই প্রতিবেদনের প্রতীয়মান আকরণ থেকে গভীর আকরণে পৌঁছে যান ওয়াসি।

হারুন দুর্গন্ধ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঠিক আগে খুবই সংকেত-গর্ভ একটি বাক্যে গল্পকার বুঝিয়ে দেন, প্রতিটি সত্যই মূলত সামাজিক : সত্যি রাস্তাঘাট, গলি-উপগলি, বাচ্চাদের ইস্কুল, পার্ক, খেলার

মাঠ, দৈত্যাকার সংসদ ভবন, অফিস-আদালতের দেরাজ, টেলিপ্রিন্টার, টিভি ক্যামেরা। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, প্রশাসন, গণমাধ্যম, শিক্ষা-ব্যবস্থা, বিনোদন-কেন্দ্র ইত্যাদি সব কিছুই যখন পচে গেছে, তা তো পৌরসামাজে দুর্গন্ধ ছড়াবেই। তাই মিলির পরে হারুন আক্রান্ত হয়; সর্বত্র দুর্গন্ধবাহী হাওয়া তারা টের পায়। কিন্তু আসল চমক থাকে গল্পকৃতির উপসংহারে। তখন বুঝি, সমগ্র নাগরিক সমাজই আক্রন্ত। হারুন ও মিলির চোখ দিয়ে আমরা দেখি : 'আশেপাশে উঁচু উঁচু প্রতিটা বাড়ি-ঘরের ছাদের রেলিঙ জুড়ে সারি-সারি ঠাসাঠাসি অগুনতি মানুষ; তাদের টানটান পিঠ, বাঁকানো, ঘাড়ের উপর কালো কালো মাথা– আকাশমুখী।' এই গল্পপকৃতির অভিঘাত তখনই পঠক টের পান। তাঁর মনে পড়ে যায় হোসেসারামাগোর অসামান্য উপন্যাস *Blindness*-এর কথা, যেখানে একটি শহরের অধীবাসীরা একে একে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে চারদিকে শুধু আদিগন্তব্যাপ্ত সাদারঙ দেখতে পেত। এখন দর্শনেন্দ্রিয়ের বদলে আক্রান্ত হয়েছে ঘ্রাণেন্দ্রিয়; আসলে তা আক্রমণ করেছে মগজকে। সংকলনের নাম-গল্প 'তেপান্তরের সাঁকো' ওয়াসির লিখন-নৈপুণ্যের দৃষ্টান্ত। কাশেম আলীর মৃত্যুকে উপলক্ষ করে যে সব অনুপুঙ্খের গ্রন্থনা করেছেন গল্পকার, তাতেই যথার্থ ছোটগল্পের মেজাজ ব্যক্ত হয়েছে। ছোটভাই মাহাবুবের টেলিগ্রাম পেয়ে মাহাতাবের ঢাকা থেকে দিনাজপুরে আসা দিয়ে বয়ানের সূত্রপাত। নিতান্ত অত্বরিত ভঙ্গিতে ওয়াসি তাঁর অন্বিষ্টের দিকে এগিয়েছেন। উপস্থাপনার এই বিশেষত্বই গল্পকৃতিকে আলাদাভাবে উল্লেখযোগ্য করে তুলেছে। ওয়াসি আহমেদের গল্পবিশ্বের বিপুল বিস্তৃতি এতে প্রমাণিত হচ্ছে।

॥ আট ॥

শিঙা বাজাবে ইসরাফিল গল্প গ্রন্থেও ওয়াসি পাড়ি দিয়েছেন চেনা থেকে অচেনা জগতে, বাস্তব থেকে অধিবাস্তবে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অন্তর্বৃত শ্লেষ আরও তীক্ষ্ণ এবং বিবরণ ও পরা-বিবরণের দ্বিরালাপ আরও ব্যাপক। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও ওয়াসি লেখেন অতিক্রমণের ভাষ্য। গল্পবস্তু ও গল্পভাষার মধ্যে সঞ্চারিত হয় যেন পরস্পরকে পেরিয়ে যাওয়ার অবৈরিতামূলক প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন গল্পকৃতি থেকে তাঁর গল্পবীক্ষাও উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্যসূচক দিকগুলি এবার লক্ষ করতে পারি।

ক. 'জানালার পর্দা চিরে পাতলা আলো ঘরবন্দী অন্ধকারে থোকা থোকা কুয়াশা ছড়িয়ে দিচ্ছিল। তাকিয়ে থেকে চার দেয়ালের ভেতরে কুয়াশার কারসাজিতে ধোঁয়া ধোঁয়া আলোটাকে অবাস্তব লাগছিল। একি ঝাপসা আলো, না উজ্জ্বল অন্ধকার।... তারপর ঘড়িতে তখন কটা হবে, দশটা হতে পারে, সাড়ে দশটা হতে পারে, বৃষ্টিটা নামল। ঘণ্টাখানেক টানা ঝরল। এরপর চিলের মতো বাতাস, হাহাকার তোলা রোদ, খয়েরি-রঙ বেড়াল। দিনটা গেল।' (ছোঁয়া)

এই দৃষ্টান্ত যে-পাঠকৃতির, তা যেন ফ্রানৎস্ কাফকার বিশ্ববিখ্যাত ছোটগল্প 'মেটামোরফেঅসিস'-এর স্বাধীন পুনর্নির্মাণ। তফাত এখানে যে রাণু নিজে যদিও বুঝেছে যে সে বেড়াল হয়ে গেছে– স্বামী রায়হান ও মেয়ে লোপা তা বোঝেনি। বাস্তবের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকে বিভ্রম– ওয়াসি এই বার্তা নিয়ে এসেছেন যেন। সেই সঙ্গে একে বলা যায় hypersensitivity বা অতি-সংবেদনশীলাতার বয়ান। গল্পভাষারও তার ইশারা : 'আড়মোড় ভেঙে একটা জড়োসড়ো রোদ উঠল। ভেজা ঘরবাড়ি গাছপালায় ইতস্তত তা দিতে হাহাকার তুলে দিগ্বদিকে ছড়িয়ে পড়ল।' গল্পকৃতি জুড়ে দেখতে পাই 'বিচিত্র বাস্তবতার দ্বিতীয় ফাঁদ'। তবে সমাপ্তি-সূচক অনুচ্ছেদেই স্পষ্ট হয় গল্পকারের দার্শনিক স্বর : 'সে (রাণু) তখন বোঝে, বুকে হাত চাপলে ক্ষতি নেই, এমনকী চোখের কোল ভাসিয়ে বড় বড় ফোঁটায় কান্না ঝরালেও না, কেবল ছুঁয়ে যেতে নেই, ছুঁয়ে যেতে নেই।' বয়ানের আপাত-বিচ্ছিন্ন অন্তিম বাক্যটি ছোটগল্পের নিজস্ব শিল্প-ধরনকে প্রকাশ করছে : 'রাণু আজকাল খুব টেলিভিশন দেখে।'

খ. 'বনসাইয়ের স্বপ্ন' আরেকটি আশ্চর্য গল্প যেখানে চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িত ঠাঁইবদল করেছে যেন। আদিত্যবাবু ও আতিকের এই সংলাপ লক্ষ করতে পারি :

'শেকড় কাটবে আরও।'

'কাটি তো।'

'গাছের?'

'আর কিসের?'

'আরে গাছের তো কাটবেই। নিজেরও কাটবে।'

'সে তো কাটা সারা। কেমিক্যাল ইঞ্জিরিয়ার থেকে মালি।'

বস্তুত এই গল্পকৃতিতে গল্পভাষার সূক্ষ্মতা ও চমৎকারিত্ব আগাগোড়া উপস্থিত। আতিক কি নিজের ব্যর্থতাজনিত হতাশার প্রতিশোধ নিতেই গাছদের বামন করে নেয়? বনসাইরা যে স্বপ্নে এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়, তাও আতিকেরই অবচেতনের অভিব্যক্তি। যদিও 'বনসাইয়ের দৌড় তো জানা'– আদিত্যবাবু বলেন ইশারা-বহুল কথা : 'স্বপ্নে তুমি তোমাকেই দেখো। আকাশ ছোঁয়ার বাতিক কম-বেশি সবার মধ্যে থাকে। স্বপ্নে এসব শেকরবাকড় বেশি গজায়।' যেহেতু কাহিনীর কোনও বাধ্যবাধকতা নেই, গল্পভাষার ঠাসবুনটে ইঙ্গিতেই তা স্পষ্টতর করে তোলেন ওয়াসি। ধরিয়েও দেন সূত্র : 'রোজ রাতে গাছগুলো যে তেড়েফুঁড়ে ওঠে, তার প্রতিশোধ নিতেই দিনের বেলা শেকড়বাকড় কাটা,

কাটতে কাটতে মেরেও ফেলা। এও হতে পারে, নিজের শেকড়বাকড় নিজেই যখন কেটেকুটে সে বামন হয়ে আছে, তখন বামন গাছগুলোকে আয়না বানিয়ে নিজেকে দেখতেই তার ভাল লাগছে।' এরপর অবশ্য ভাষ্যের প্রয়োজন থাকে না আর। এভাবেই পরিণতিহীন সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায় গল্পকৃতি; ভাষ্যকার-কথকস্বর বুঝি-বা লেখকের হাত চেপে ধরে: 'আকাশ বলে কিছু নেই, তবু মারি-বাঁচি, আকাশ ধরা চাই। লাগামছাড়া আকাঙ্ক্ষা, মানুষের মতোই। ... আতিক হতভম্ব হয়ে দেখে, বাড় থামানো যাচ্ছেনা। তার কাটছাঁটকে টেক্কা দিয়ে ডালপালা-পাতায় জেল্লা বড়ছে, আর সবুজ-কালচে চোখেমুখে লকলকে লোভ, না-কি লাগমছাড়া পাগলা আকাঙ্ক্ষা।'

আদিত্যবাবু আতিকের কাছে (আসলে পাঠকের কাছে) স্পষ্ট করে দেন, 'ভেবেছিলাম, গাছগুলোকে বাড়তে না দিয়ে নিজের উচ্চাশা দমন করাবে। পারলে না। মনে হচ্ছে, তোমার স্বপ্ন, অ্যাম্বিশন তোমর গাছগুলোকে পেয়ে বসেছে।' অতএব এবার আতিককে বুঝতেই হয় বনসাইয়ের আকাশযাত্রা। যদিও 'সে তো মাথা গুঁজেই থাকতে চেয়েছিল। তাই তো বামন পোষা'। কিন্তু 'বনসাইরা তো তার পরাজয়কে নিয়েই খেলেছে। কিন্তু এই যে বামনগুলো রাতের আকাশ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, চাঁদ-টাদ মানছে না, ঝড়বাদলা, বিপদআপদ কোনও কিছুই পরোয়া করছে না– এ দৃশ্য কি তার একারই দেখার কথা?' যেন এই কথাগুলি লিখে গল্পকার তাঁর পাঠকদের নিবিড় পাঠে প্ররোচিত করছেন। আর, সমগ্র পাঠকৃতি জুড়ে যা ছিল একান্তভাবে ব্যক্তি আতিকের অনুভব, তাকেই সমাপ্তি-সূচক দীর্ঘ বাক্যে সামূহিক করে তুলে গল্পকৃতিকেই নতুন মাত্রায় উত্তীর্ণ করেছেন ওয়াসি : 'আর চিৎকার শুনে যারাই ঘুম-টুম ফেলে বাইরে বেরুবে, তারা তো প্রথম ধাক্কায় তারই মতো হতভম্ব হবে, তারপর তাদেরও কাঁপুনি আসবে, শিউরে শিউরে উঠবে সারা শরীর, শরীরের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা বেশি বেশি লাফাবে আর আকাশমুখো তাদের জোড়া-জোড়া ঘুমজর্জর চোখ অস্থির, অবিশ্বাস্য আবেগে, মুক্তিতে জুড়িয়ে যাবে, তারই মতো।'

গ. 'কলাপাতা-শাড়ি ও হাবুল সেখের বাড়ি ফেরা' নামক গল্পটিকে কোন্ বিশেষণ দিয়ে বোঝাতে পরি, তা ঠিক ভেবে পাচ্ছি না। বিচিত্র? জটিল? অদ্ভূত? কোনওটাই না; এই তিনটিই হয়ত ব্যবহার করতে পারি, তবু তার অনেকখানি অধরা থেকে যাবে। এ যেন গল্পের মধ্যেই বিকৃত কলাপাতা রঙের শাড়ি পরানো, যাকে শাড়ি পরানো বলে না। 'কাটাছেঁড়ায় যেমন ডাক্তারখানায় ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়...(তেমনই) 'পা থেকে গলা পর্যন্ত প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে গোটা শাড়িটা শেষ করে' (মনে করা যে) 'এবার আবরু রক্ষা হল।' গল্পকৃতির তাৎপর্য বোধহয় বোঝানো গেল। আলী আমজাদের মতো উচ্চবিত্ত

আভিজাত্যগর্বী মানুষের স্ত্রী সামিনা বাইশ বছর আগে গ্যাংরেপ্‌ড্‌ হয়েছিল, তার দুঃস্মৃতি অবশ্য মুছে গেছে; নানা অনুপুঙ্খের সাহায্যে গল্পকার এই নিবীর্য সময়ের প্রতিনিধির কথকতা করেছেন। হয়ত এখানে কোনও কোনও পাঠকের মনে পড়বে হাসান আজিজুল হকের একটি বিখ্যাত ছোটগল্পের কথা। তবে গল্পভাষায় নির্মাণ ও উপস্থাপনা-রীতিতে দুটি স্বতন্ত্র কক্ষপথে পরিক্রমা করছে। আলী আমজাদের বানানো পৃথিবীতে হাবুল সেখের মতো গ্রামীণ মানুষ আকস্মিক উল্কার মতোই বেমানান এবং অনভিপ্রেত। তাই শুধুমাত্র তার উপস্থিতিতে ভেঙে পড়ে উচ্চবর্গীয় নির্মাণ আর আলী আমজাদ প্রতিপন্ন হয় কাকতাড়ুয়া হিসেবে। ওয়াসি কি এক ধরনের poetic justice -এর ব্যবস্থা করেন তাকে দিয়ে এই কথা বলিয়ে : 'হাবুল সেখ, তুমি বুঝতে পারছ না, আমার বুক জ্বলছে। এরকম জ্বলতে থাকলে আমি পুড়ে খাক হয়ে যাব। ... বুঝতে পারছ, কী বলছি, একটা সুযোগ হাবুল সেখ।' হ্যাঁ ওয়াসি, আমরা বুঝতে পারছি, শিল্পসম্মত মুখোশের প্রদর্শনী সত্ত্বেও আমাদের কাকতাড়ুয়া-চরিত্র গোপন নেই আর। এবং এখানেই গল্পত্ব।

ঘ. 'মিস্‌ নমিতা'র বয়ান হওয়ার ঠিক আগে যে-কথাগুলি ছাপা হয়েছে, তাতে গল্পকার আসলে পাঠকের সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছেন। একজন অন্তেবাসী মেয়ে নিজের কথা বলে যাচ্ছে, লেখক কেবল 'অনুলিখন পদ্ধতির আশ্রয়' নিয়েছেন কেননা ওই বর্গের ভাষা ও চেতানাকে 'সাহিত্যিক' বাচনে হুবহু তুলে আনা কঠিন। তো, নামিতা নিশ্চয় বেবী হালদার নয় যার তথাকথিত আত্মজৈবনিক বয়ান নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নামজাদা লেখক-বুদ্ধিজীবীরা বেজায় হইচই করেছেন। এতে কথার মোড়ক আছে অনেক, সেই অনুপাতে শাঁস কম। বিপ্রতীপ দর্পণে নিরালোক পরিসরকে দেখার চেষ্টাকে ছাপিয়ে বড়ো হয়ে ওঠে পাঠকৃতির ভেতর থেকে উঠে-আসা প্রত্যাখ্যান, নিম্নবর্গীয়দের অসংগঠিত চেতনায় নৈতিকতা সম্পর্কে নঞর্থক প্রতিক্রিয়া : 'একটা কথা ওরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে, যৌন-নিপীড়ন। এ যে কী জীনিস– খায়, না মাথায় দেয় বোঝাতে গিয়ে খামোখা একের পর এক প্যাঁচ লাগায়।... শুনে হাসি আর ভাবি, তোমরা ঠিকই আসমানের বাসিন্দা, আসমানেই থাকো।'

ঙ. 'আমাদের মীনা'র শুরুতেই বেজে ওঠে কার্নিভালের সুর; প্রতাপমত্ত রাজনৈতিক সমাজের সঙ্গে প্রান্তিক মানুষজনের যোজন-যোজন ব্যবধান অম্ল-কষা, কৌতুক-গর্ভ ভাষায় বিবৃত হয়েছে। মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানানোর প্রস্তুতি সানুপুঙ্খ বিবরণে স্পষ্ট করার ফাঁকে গল্পকার যে আনুষঙ্গিক কিছু বাস্তব বারুদ পুরে দেওয়ার ভঙ্গিতে জুড়ে দিয়েছেন, এতেই তাঁর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। মন্ত্রীর সঙ্গে মীনার কথা ও তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া, স্বপ্ন মীনার ইচ্ছাপূরণ, ক্রমশ চেতনা থেকে মীনার অবচেতনায় পিছলে যাওয়া –

এসবই ব্রাত্যজনের রুদ্ধকথার বিষাদময় গাথা। বিষাদ অবশ্য প্রচ্ছন্ন, প্রতীয়মান আকরণে কেবল ধূসর নিরর্থকতার সমাবেশ।

চ. ওয়াসির বৈচিত্রসন্ধানী শিল্পিত নিদর্শন বলা যায় 'মধ্যদিনের গান' নামক গল্পকৃতিকে। এই বয়ানে নৈসর্গিক অনুপুঙ্খগুলি চিহ্নায়িত যেমন, তেমনই সূত্রধর-সত্তা মাশুক আলীর প্রতীকী অস্তিত্ব। তবে এই ছোটগল্পের আবেদন অনেক বেশি হবে সেইসব পাঠকের জন্যে যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশভাগের মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করেছে। এবং, সেই সঙ্গে খণ্ডিত ভারতবর্ষে বা বাংলাদেশে যাঁরা পূর্বজদের চোখের তারায়, স্মৃতির মন্থনে, স্বপ্নময় আকাঙ্ক্ষার শিকড়ে জলের ঘ্রাণের জন্যে অফুরান আকুলতা অনুভব করেছেন। তাই এই গল্পবীজ ও তার অঙ্কুরায়নের তাৎপর্য বোঝার জন্যে ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক সমালোচনার পুরোনো বিবাদ স্থগিত রাখাটা জরুরি। আরও একটি অস্বস্তিকর কর্কশ সত্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে বাংলা ভাষার হিন্দু শরণার্থীর বাস্তুচ্যুতি ও পুনর্বাসনের সংকট-যন্ত্রণা-উত্তরণ নিয়ে যত ছোটগল্প লেখা হয়েছে, সে-তুলনায় মুসলমান উদ্বাস্তুর অনুরূপ সমস্যা নিয়ে লেখাপত্র যথেষ্ট কম। হাসান আজিজুল হকের রসোর্ত্তীর্ণ ছোটগল্পগুলি ব্যতিক্রম হিসেবেই গণ্য।

'মধ্যদিনের গান'-এ মাশুক আলী বারবার ভারত থেকে বাংলাদেশে আসে এবং বারবারই ফিরে যায়। শুরুতেই, নৈসর্গিক অনুপুঙ্খের সূত্রে, গল্পকার ইশারায় জানিয়ে দেন– রাষ্ট্রনৈতিক বিভাজন ও ধর্মীয় ভেদ-বুদ্ধির নাগালের বাইরে থাকে শেকড়ের জন্য টান : 'চেনা পথে পা ফেলতে দেখল অল্প দূরে গাঢ় লাল কুসুম ভেঙে সূর্যটা আকাশ ভাসিয়ে গলছে। ওপারে এতটা গলে না। ডোবার সময় হলে গলে– লাল হয়ে নরম হয়ে গলে, তবে এত না। শুখা, টানটান ভাব থাকে। শুখা মটি শুখা আসমান।' ভাষার এই লোকয়ত বলনও অর্থবহ। মাশুক স্থায়ীভাবে থাকার জন্য তৈরি বলেই হিন্দুস্থান ছেড়ে বাংলাদেশে আসে যেহেতু তার সমস্ত আত্মীয়-স্বজন এপারে। ওরাই তাকে 'চলে আয় চলে আয়' বলে ডাকে। কিন্তু এ-প্রসঙ্গেও খুব তাৎপর্যপূর্ণভাবে কথকস্বর জানিয়েছে যে মানুষ তার আজন্ম-পরিচিতি নিসর্গ, মাটি ও আকাশের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। তাই 'পাড়ি দিয়ে বেশি ভেতরে অবশ্য কেউ যায়নি, আশেপাশেই থেকে গেছে– নবাবগঞ্জ, রাজশাহী, বড়জোর পাবনা। ভিনদেশে বসেও ফেলে আসা হাজিপুর, রহমগড়, পাকড়াখুলির রাঢ় মাটির শুখা হাওয়া-বাতাসের একটুখানি ছোঁয়া যদি মেলে, এ আশায়ই যেন ধারেকাছে থাকা।' কিন্তু সাম্প্রদায়িক পরিচিতির মোহে যাদের আত্মবিস্মৃতি হয়, ওরাই পুরোপুরি ভুল কথা প্রচার করে : 'দেশ মানে তো মাটি না রে– দেশ হল গিয়ে মানুষ, আত্মার আপনা মানুষ– এক লহুর মানুষ।' ওরা যে-মৌলিক সত্যটি জানে না, তা হল, দেশ মানে কাগুজে মানচিত্রও নয়।

কারা ‘ওরা’ এরং কারা-ই বা ‘আমরা’– সরল-সহজ মাটির মানুষ মাশুক আলীর কাছে তা ধোঁয়াটে থেকে যায়। দু’মাস ধরে কানে আত্মীয়স্বজনের ‘মিষ্টি কথার মধু’ নিয়েও তাই সে হাঁপিয়ে ওঠে, কিছুটা ঘাবড়েও যায়। কেননা হালজমির সঙ্গে তার সম্পর্ক, আকাশ-বিহারী আত্মীয়দের তার অনাত্মীয় মনে হবেই। কথকস্বর জানায়, ‘যতই রক্তের সম্পর্ক থাকুক, মানুষগুলোকে চেনা মনে হয় না, খুঁটিয়ে দেখলে বড্ড অচেনা। কথাবার্তায় অকারণ হইচই। কাজ-কর্ম, চলাচলনে উড়ুউড়ু ভাব। অল্পবয়সীদের মধ্যে সেটা যেন মাত্রছাড়া। মাথায় সারাক্ষণ গিজগিজ করছে রিয়াল, দিনার, মিডলইস্ট নয়ত নিদেনপক্ষে মালয়েশিয়া। আলাপ-আলোচনায় ভিসা, এনওসি, ওয়ার্ক পারমিট।’ এই কিন্তু বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বাস্তব যাতে পৌরসমাজ ইংল্যান্ড-আমেরিকা-কানাডা-অস্ট্রেলিয়ার সস্তা শ্রমিক বা প্রান্ত স্বত্বভোগীদের জোগান দিচ্ছে। খণ্ডিত ভারতের কোনও প্রান্তিক কৃষিজীবীর কাছে তাই এদের বাচন দুর্বোধ্য গ্রিক হতে বাধ্য। মাশুক আলীর বলতে পারত, তোমাদের ভাষা আমার কাছে কিছুমাত্র সংযোগের বোধ জাগায় না। একমাত্র বড়চাচার মেয়ে রাবিয়া ভিন্ন স্বরে কথা বলত। ‘সব ছেড়ে’ আসার যন্ত্রণার দিকে ইশারা করত। তাই মাশুকের মনে প্রশ্নের আবর্ত তৈরি হয়েছিল : ‘দেশ মানে মানুষ? জ্ঞাতি-গোষ্ঠী? দেশ মানে...। মানেটা মগেজে খেলছিল না বলেই যেন মাথাটা একনাগাড়ে জ্বলে যাচ্ছিল। তবে ভুল হোক, শুদ্ধ হোক, মানে একটা সে তখন করে ফেলেছিল। জ্ঞাতি-টাতি না, ঘরদোর ক্ষেত-জমিও না, বরং এসবের বাইরে, সেই যে রাবেয়ো বলেছিল, আর সব। এই আর সব– ‘ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, দেখাও কি যায়?’ প্রশ্নচ্ছলে মীমাংসা দিয়েছেন ওয়াসি। দেখা যায়, তবে দেখে তারাই যারা বাখতিনকথিত দ্রষ্টা চক্ষুর অধিকারী। ব্রাত্য মাশুকও দেখেছিল; আর দেখেছিল বলেই ঝড় বুকে করে ফিরে গিয়েছিল আপন দেশে। জেনেছিল, ‘দেশ তবে ঘাস, মাটি!’

ওয়াসি এই গল্পকৃতিতে কাব্যিকতা ছড়িয়ে দিয়েছেন অন্তঃসলিলা ফল্গুধারর মতো । প্রগাঢ় অনুভবের দ্যোতনায় ভাষা উদ্ভাসি হয়েছে। খণ্ড-সময়ের কুশ্রীতা গুজরাটের গণহত্যার অনুষঙ্গে উপস্থিত থাকলেও বড়ো সময়ের মহাদিগন্তই প্রাধান্য পেয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের আলাদা দেশের পাটিগণিত কত ব্যর্থ, পূর্ব-নির্ধারিত ধারণার বশে দেশান্তরী হওয়া কত নিরর্থক– গল্পকার তা উন্মোচনে দ্বিধাহীন। তাঁর বাচনকে একটুখানি পালটে নিয়ে লিখতে পরি : ‘বিদ্যা নেই শিক্ষা নেই, মুসলমানিত্ব আর হিন্দুয়ানি ধুয়ে এ যুগে কতদূর।’ তবে কথক-স্বরের এই স্পষ্ট অবস্থানে নয়, গল্পত্ব রয়েছে মাশুক আলীর অনুভবের চিহ্নায়িত অভিব্যক্তিতে। তাই ‘শূন্য দুপুরের হু হু কান্না নিয়ে মাশুক আলী পাগল হয়ে পালাল।... মাঝদুপুরে গনগনে রোদের সেই আকাশ-ভাঙা টান – নিঃশব্দ আবার বিচিত্র শব্দময় – কান্নার মতো,

রহস্যময় আকুল পিপাসার মতো।' অতএব এ তো অনিবার্য ও স্বাভাবিক যে কোনও এক 'প্রখর মধ্যদিনে মাশুক আলীর বুকে এক দিকচিহ্নহীন দুপুর জেগে ওঠে' আর 'একটু একটু করে হৃৎপিণ্ড মুচড়ে একটা আকুল কান্না গমকে গমকে আকাশ দাপিয়ে বেড়ায়।' কী তাহলে করতে পারে মাশুক আলী!

বাংলা ভাষার লেখা হয়েছে এমন অবিস্মরণীয় গল্পকৃতি, এই জন্যে কথাকার ওয়াসি আহমেদকে টুপি খুলে সেলাম জানাতে পারি।

ছ. 'মধ্যদিনের গান' পড়ার ঘোর কাটিয়ে উঠতে না উঠতে মুখোমুখি হই 'শিঙা বাজাবে ইসরাফিল', 'শীত পিপাসার দেও-দানব'-এর মতো আদ্যন্ত নাগরিক বিষবস্তু ও উপস্থাপনার রীতিতে বিশিষ্ট দুটি পরস্পরভিন্ন প্রতিবেদনের। হিজড়া বলে পরিচিত ইসরাফিলকে নিয়ে কি এক ধরনের আধুনিকোত্তর ফ্যান্টাসি তৈরি করতে চেয়েছেন গল্পকার? নাগরিক মানুষের অজানা, ঝাপসা অপরাধবোদের প্রসঙ্গ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ? না-কি একে বলা যায় আধুনিকোত্তর মুক্ত বয়ানের প্রস্তাবনা? তাহলে 'শিঙাটা অস্তিত্বের শেকড় অব্দি সন্ত্রাস ছড়ায়' কেন?

জ. আবার 'শীত পিপাসার দেও-দানব' পল্লে পলাশের হারিয়ে যাওয়া কি উপলক্ষ মাত্র? মিহির দেবনাথের ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়া কিংবা মল্লিকা-জবা-সুধারানীর সূত্রে দেশত্যাগের প্রসঙ্গ শুধু অন্তঃস্বর জোগান দেওয়ার জন্যে, এমন মনে হয় না। মন্টুর উপস্থিতি বা মিহির দেবনাথের মনোবিকারসম্ভূত অন্তিম আচরণ পাঠককে ভাবায়। গল্প-নামে যে শীত পিপাসার কথা রয়েছে, তা কিসের জন্যে? কেনই বা 'আচম্‌কা শীতের পাল্লায়' পড়ে সে? তা যে শুধুমাত্র নৈসর্গিক অনুপুঙ্খ নয়, তার ইঙ্গিত পাই যখন গল্পকৃতির অন্তিম পর্যায়ে মিহির দেবনাথ শীতের কথা ভাবে এবং গল্পকার এইসব অনুষঙ্গ ব্যবহার করেন : 'মেঘ কুয়াশা, আর শীত-অন্ধকারে প্লেনটা বিকট শ্বাস টেনে টেনে এগুচ্ছে। হঠাৎ সে টের পায়, পিপাসায় গলা শুকিয়ে আসছে। এই শীত, এখন আবার পিপাসা!' গল্পচ্ছলে কি তবে উৎকেন্দ্রিক জীবনের কিমিতিবাদী উপস্থাপনা করতে চেয়েছেন গল্পকার?

ঝ. ওয়াসির গল্পবোধের সূক্ষ্মতর অভিব্যক্তি দেখতে পাই 'ঋতুচক্রে' ও 'ভারহীন দৃষ্টিহীন' এই দুটি ছোটগল্পে। এদের নিবিড় পাঠ আমাদের নিয়ে যায় জটিলতর সময় ও পরিসরের সূক্ষ্মতর ভাষ্যের প্রস্তাবনায়। কত বিচিত্র ধরনের ছোটগল্প যে লিখতে পারেন ওয়াসি, এই ভেবে আমরা বিস্মিত হই। প্রথমোক্ত গল্পটি যেন অধিবাস্তবে আধারিত। অগুনতি পিঁপড়ের আক্রমণের বিবরণই বুঝিয়ে দেয়, গল্পকৃতি চলে যাচ্ছে বাস্তবের বাইরে। পাঠকের মনে আসে গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের বিশ্ববন্দিত রচনা

Hundred years of solitude-এর অন্তিম অংশটি যেখানে একই রকমভাবে উরশুল্লা কীটনাশক দিয়ে অনবরত সারিবদ্ধ পিঁপড়েদের মেরে ফেলত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারই সদ্যোজাত শেষ বংশধর লক্ষকোটি পিঁপড়ের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। তবে মার্কেজের জাদুবাস্তব আর এই গল্পকৃতির অধিবাস্তব এক গোত্রভুক্ত নয়। বিবরণকে কীভাবে পরা-বিবরণের পর্যায়ে পৌঁছে দিতে হয় ওয়াসি যেন সেই নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

॥ নয় ॥

নিজের গল্প সম্বন্ধে ওয়াসি কী ভাবেন তার কিছু ইশারা মেলে *নির্বাচিত গল্প*-এর 'স্বপ্ন যখন প্রতিতুলনা' শিরোনামের কথামুখে। ওয়াসি লিখেছেন : 'তিনি ও তাঁর পাঠক মিলে জিজ্ঞাসা-কন্টকিত ঘোর ঘোর পথে আলো ফেলবেন।' এই ঘোর সুপরিকল্পিত ফ্যাস্টাসির যা আমাদের সাম্প্রতিকেই প্রচ্ছন্ন থাকে। গল্পকারের মনে জীবন সম্পর্কে অজস্র জিজ্ঞাসা রয়েছে বলেই তা সরাসরি উপস্থাপিত না হয়ে এভাবে ফ্যান্টাসির আশ্রয় নেয়। ওয়াসির এই প্রবণতা আমরা লক্ষ করেছি বিভিন্ন গল্পে। বস্তুত ওয়াসির বাস্তববোধেই প্রচ্ছন্ন থাকে ঐ প্রকল্পনার পরিসর। আচমকা তাঁর বয়ান বাঁক ফেরে এরই গোপন আততিতে। এ-প্রসঙ্গে লিখতে পারি 'বীজমন্ত্র', 'গর্তসন্ধান', 'নাগাল', 'খাঁচা ও অচিন পাখি', 'স্মৃতিস্তম্ভ কিংবা এলেমানের লেজ', 'শিঙা বাজাবে ইসরাফিল', 'লাইলি সুন্দরী ও জীবন যাপনের রূপকথা' প্রভৃতি গল্পকৃতির কথা। বাস্তবের সঙ্গে সমান্তরালভাবে উপস্থিত ঐ প্রকল্পনার পরিসর যে ওয়াসির চেতনাবিশ্বে বারবার ঘুরে ফিরে আসে, এর তাৎপর্য কী? বাস্তবকে তার যাবতীয় কৌণিকতাসহ উপস্থাপিত করতে গিয়ে গল্পকার নিশ্চয় এই অনুভবের মুখোমুখি হয়েছিলেন যে প্রচলিত মাপ ও আকল্প দিয়ে এর সব গলিখুঁজির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। নাগালের বাইরে থেকে যাচ্ছে অনেক দ্যোতনা ও সম্ভবনা।

কথামুখে ওয়াসি জানাচ্ছেন, 'সচেতন স্বপ্নের জাল বোনার নাম লেখা'। স্পষ্টতই প্রকল্পনা-নির্ভর পরাবাস্তবকেই তিনি 'স্বপ্ন' বলতে চেয়েছেন। ওয়াসি লিখেছেন : 'স্বপ্নের প্রসঙ্গটা এ জন্য যে লেখার সাথে এর সম্পর্ক গোলমেলে ঠেকলেও আদতে তা অনেকটাই নিবিড়। অচ্ছেদ্যও কি নয়? লেখার মতো একটা সচেতন প্রক্রিয়ার সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে স্বপ্নের বিরোধ বিস্তর। চেতনাতীত অবস্থায়ও স্বপ্ন প্রবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; যে-কারণে স্বপ্নে যা কিছু বিক্ষপ্ত, বিশৃঙ্খল তা মেকি নয়– পাত্র-পাত্রী ঘটনাপ্রবাহ এবং যাবতীয় তোড়জোড় বাধাবন্ধনহীন, স্বাধীন। লেখা পুরোদস্তর পরাধীন, আর সচেতন বলে স্বপ্ন যা নয়,

লেখা শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তরহীন তাই, কৃত্রিম।...বোর্হেস যখন বলেন, 'Writing is nothing other than a guided dream' তখন 'সচেতন'-এর তুলনায় বহুগুণ প্রকাশক্ষম ও লক্ষ্যমুখী guided -এর বশ্যতা না মেনে উপায় থাকে না।'

এই কথাগুলির দিকে মনোযোগ দিতে হচ্ছে কেননা এর মধ্যে নিহিত রয়েছে ওয়াসি আহমেদের নান্দনিক প্রত্যয়ের মূলসূত্র। আর সেই সঙ্গে কিছুটা তর্কেও জড়িয়ে পড়তে হয়। তবে তর্কের কথা পরে। প্রথমত, প্রাগুক্ত বক্তব্যই ফিরিয়ে আনছি যে, ওয়াসি যাকে স্বপ্ন বলছেন তাকে ভাবা যেতে পারে প্রকল্পনা-নির্ভর পরাবাস্তব পরিসর। বাস্তবকে তার সমগ্রতায় ধরতে চান বলেই ওয়াসি যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের সীমানাকে প্রসারিত করতে চান। ১৯২৪ সালে আঁদ্রে ব্রেতোঁর নেতৃত্বে শিল্পে-সাহিত্য যে বিনির্মানপ্রবণ পরাবাস্তববাদী তত্ত্বচিন্তার সূচনা হয়েছিল, সেই নিরিখে অবচেতনের পরাপরিসর হয়ে উঠল সমস্ত শিল্প-মাধ্যমের মুক্তির অবলম্বন। বাচনাশ্রয়ী মাধ্যমগুলিতে, মূলত কথাসাহিত্যে, ভাষা ও পরাভাষার সম্মিলন অভূতপূর্ব সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছিল। এক সময় মতবাদ হিসেবে পরাবাস্তববাদ নিষ্প্রভ হয়ে এলেও পরাবাস্তব-অবচেতনা-পরাভাষা-স্বপ্নমেদুরতা ও সংকেতগর্ভ চিহ্নায়নের সন্ধান অটুট রয়ে গেল।

বিশ্বসাহিত্যের নান প্রান্তে সূচিত হল বিচিত্র সব প্রবণতা। হোর্হে লুই বোর্হেসের বিখ্যাত 'Labyrinths' বা গোলকধাঁধায় রহস্যময় দ্যোতনার যে পরিচয় পাই, তা-প্রাগুক্ত 'Guided Dream' এরই নির্দশন। ওয়াসি তাঁর গল্পকৃতিতে এই ভাবনা দ্বারা অনুপ্রাণিত। তবে একটি বিশেষ প্রেক্ষিতে লেখাকে তিনি পুরোদস্তুর পরাধীন ও কৃত্রিম বললেও তাঁর পাঠকেরা ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। সাহিত্যিকতা (Literariness) গড়ে উঠেছিল বহু শাতব্দীর প্রাতিষ্ঠনিক অভ্যাসে; পরাবাস্তববাদ সেই অচলায়তনে আঘাত হেনেছিল স্বপ্ন-প্রকল্পনা দ্বারা সঞ্চালিত স্বতোলিখন পদ্ধতি দিয়ে। প্রাতিষ্ঠানিকতার পাথুরে দেওয়াল চূর্ণ করে প্রবাহিত হয়েছিল যে নতুন উজ্জীবিত সৃষ্টিশীল রচনা, তাকেই ষাটের দশকের গোড়ায় আকরনাত্তরবাদের প্রবক্তা রোলাঁ বার্ত 'লেখা' বা 'Ecriture'-এর আখ্যা দিয়েছিলেন। প্রাতিষ্ঠনিকতার প্রতিস্পর্ধী বলেই এই 'লেখা' সর্বতোভাবে স্বাধীন ও অকৃত্রিম। সচেতনভাবে স্বপ্নের জাল বোনায় লেখার আশ্চর্য স্থিতিস্থাপকতাই প্রমাণিত হয়।

স্বয়ং ওয়াসিও প্রাতিষ্ঠানিক রচনা-পদ্ধতির প্রতিস্পর্ধী এবং এইজন্যে প্রকল্পনার উপদান ব্যবহার করেও সাধারণ গল্পকারের তুলনায় বহুগুন বেশি প্রকাশ সামর্থ্যের অধিকারী। ওয়াসির লেখা দৃশ্য বা অদৃশ্য কোনো প্রতাপের বশ্যতা স্বীকার করেনি। তাঁর গল্পবিশ্ব পরিক্রমা করে প্রাগুক্ত কথামুখের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যকে সমর্থন জানতে হয় : 'ব্যাপার যদি হয় জীবনকে ধারণ করা – অকপটে,

গভীরভাবে – তাহলে স্বপ্ন যতই অকপট-নির্ভেজাল হোক, গভীরতার খোঁজে একমাত্র লেখাই জরুরি হয়ে ওঠতে পারে।' নিশ্চয়। আর, যে-লেখা অকপট ও গভীরতাসন্ধানী, তা অবলীলায় স্বপ্ন ও প্রকল্পনা, বাস্তব ও পরাবাস্তবের দোলাচলকে আত্মস্থ করে নিতে পারে। এই লেখা 'guided' হওয়ার চেয়েও আরও অনেক উচ্চতর ও গভীরতর দায় পালন করতে সমর্থ।

আর, লক্ষ করতে হয় ওয়াসির এই বক্তব্যও : 'লেখাকে মানুষের বাননো শিল্প হিসেবেই টিকে থাকতে হয়।' অর্থাৎ অনুপম সৃষ্টিও কুশলী নির্মাণের ওপর নির্ভরশীল। সেই সঙ্গে লেখার একটা বাড়তি সুবিধা পাওয়ার কথাও ভেবেছেন তিনি। পর্যবেক্ষণের একান্ত নিজস্ব ক্ষেত্র কী ভেবে নিয়েছেন ওয়াসি, পাঠককে তা খুঁজে নিতেই হয়। নইলে 'ডলফিন গলির কুকুরবাহিনী' বা 'মুগ্ধতার কারসাজি' রচিত হতই না কখনও। সবচেয়ে লক্ষনীয় হল, তাঁর পর্যবেক্ষনের একান্ত নিজস্ব ক্ষেত্র অনেক। তিনি যা দেখেন তাকেও অনবরত নানা দৃষ্টিকোণ থেকে পরখ করে নিতে চান। এর চমৎকার দৃষ্টান্ত 'লাইলি সুন্দরী ও জীবনযাপনের রূপকথা' কিংবা 'সুন্দিকাঠের আলমারি'র মতো গল্প। এই দ্বিতীয়োক্ত গল্পকৃতি কি ঔপন্যাসিক ওরহাম পামুকের 'আমার বাবার স্যুটকেস' শীর্ষক নোবেল-ভাষণের স্বাধীন বঙ্গীয় পুনঃসৃষ্টি? পামুকের নোবেল-ভাষণ ছিল মেধাবী চিন্তার বিন্যাস আর ওয়াসির সৃষ্টিময় গল্পকৃতি জুড়ে রয়েছে লুপ্ত পরম্পরার বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য ও অস্তায়মান মহিমা পরিগ্রহণে অসমর্থ পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিক্রিয়া। যা বিবৃত হয়েছে তা আসলে প্রতীকের নির্মিতি।

ওয়াসি তাঁর কথামুখে আরো জানিয়েছেন : 'টানা-লম্বা, বাসি মুখস্থ ছবি আঁকার চেয়ে জীবনের ব্যাখ্যাকার হতেই (তাঁর) লোভ। স্বপ্নের চেয়ে যা কম কুহকী নয়।' সত্যিই তাই। প্রায় সবগুলি গল্পেই অনুভব করি একজন ভাষ্যকারের নিভৃত উপস্থিতি। অথচ কোথাও গল্পত্বের সঙ্গে ঐ অনুভবের কোনো বিরোধ তৈরি হয় না। আরও একটি কথা না লিখলেই নয়। শুধু বোর্হেসের নাম করেছেন বলেই নয়, বিশ্ব সাহিত্যের তন্নিষ্ঠ পাঠক ওয়াসি বাচনের অন্তরবর্তী বোধের উদ্ভাসে বারবার ইশারা দিয়ে যান, তাঁর পাঠঅভিজ্ঞতা কত ব্যাপক ও কত গভীর। বিশষত যেখানে অস্পষ্টভাবে ভাষ্যকারের উপস্থিতি অনুভব করি, সেখানেই অলক্ষে ছায়া দুলে ওঠে মিলান কুন্দেরা কিংবা ওরহাম পামুকের মতো বরেণ্য কথাকারদের। না, এই নিবন্ধপ্রয়াসি প্রচলিত অর্থে কোনো প্রভাবের কথা ভাবছে না। বরং লিখতে চাইছে প্রাচীন সেই রূপকটি ব্যবহার করে : জ্বলন্ত দীপশিখা থেকে নিজস্ব প্রদীপের আগুন চয়ন করে থাকবেন ওয়াসি। কেননা তাঁর বয়েছে একান্ত বঙ্গীয় পরিসরের 'গল্প'; তিনি চান শুধু আন্তর্জাতিক লিখন প্রণালীর উত্তাপ।

এ প্রসঙ্গে আরেকবার পড়তে হয় ওয়াসির নিজস্ব বয়ান ঃ 'গভীরতা ততটাই গভীর যতটা জটিল, যার জট খুলতে গিয়ে লেখকের অনিঃশেষ আত্মজিজ্ঞাসা: আমি কী করে জীবনের ব্যাখ্যাকার হব?...সমস্যা হয়েতো এখানে যে ব্যাখ্যাকার হতে চেয়ে লেখককে মুখোমুখি হতে হয় বিচিত্র সব সম্ভবনার যা পরস্পর সংঘাতপূর্ণও বটে।' এর চমৎকার দৃষ্টান্ত 'লাইলি সুন্দরী ও জীবন যাপনের রূপকথা' গল্পটি। একটু আগে যে প্রকল্পনাময় পরাবাস্তবের উল্লেখ করেছি, এই গল্পকৃতি তার হদিশ দেয়। আবার বাস্তব হয়েও যা বাস্তব নয়, সেই পরিসরের অসামান্য উপস্থাপনা দেখাতে পাই 'ত্রিসীমানা' নামক গল্পে। কেন পরিনামহীন আত্মাজিজ্ঞাসা গল্পকারের কাছে হয়ে ওঠে অশেষ আত্মজিজ্ঞাসা, এর ইশারা রয়েছে বাচন ও পরাবাচনের নিরবচ্ছিন্ন গ্রন্থনায়।

ওয়াসি আহমেদের নন্দনচিন্তা, আস্তিত্বিক জিজ্ঞাসা ও দেশকালের বিশ্লেষণমূলক উপস্থাপনা তাঁর প্রখর প্রশ্নমুখর পর্যবেক্ষনকে বরাবারই মান্যতা দেয়। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই জানিয়েছেন: 'চারপাশের যে জগৎ ও জীবনের চালচিত্র সারক্ষণ চোখে ঝাপটা দেয় তা প্রকৃত পরিস্থিতির প্রতিচ্ছবি হিসেবে কতটা নির্ভরযোগ্য, লেখকের এ সংশয় দীর্ঘদিনের । তার সংশয়ই তাকে বলে দেয়, চারপাশের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতা ইন্দ্রিয়াতীত জগতের প্রতীক মাত্র – প্রতিচ্ছবি নয়, সিমবল। প্রতীকগুলো স্থির, বাঁধাধরা নয় বলে খাবনামা ঘেঁটে স্বপ্নের মানে খোঁজার বদলে লেখককে খুঁজতে হয় তার মতো করে– অচেনা অনির্দিষ্ট, গোলকধাঁধাময় পথেঘাটে। ওপরতলের বাস্তববতাকে মনে হতে পারে ভাওতা, কৃত্রিম, আনরিয়েল। লিখতে গিয়ে এরকমই ভেবে এসেছি। একেক সময় মনে হয়েছে যা-ই লিখি, ঘুরেফিরে অতল অনির্দিষ্টতায় পাক খাওয়াই সার।' যে-জগৎ কেবলই সংশয় জাগায়, সেই জগৎ-ই নিরন্তর প্রতীক নির্মাণ করে। তার সঠিক ঠিকানা না আলোয়, না অন্ধকারে, না বাস্তবে, না স্বপ্নে। খুঁজতে খুঁজতে লেখক চেনা থেকে অচেনায়, নির্দিষ্ট থেকে অনির্দেষ্টে, রৈখিক আয়তন থেকে গোলকধাঁধার পৌঁছে যান। ওইখানেই রচিত হয় তাঁর গল্পকৃতির পরাপরিসর, যে বিন্দু থেকে আতিব্যক্ত বাস্তবতাকে মনে হয় কৃত্রিম, ভাঁওতা, এমনকী অবাস্তব। ওয়াসি 'সুন্দিকাঠের আলমারি' বা 'হোয়াইট ম্যাজিক' লেখেন অতল অনির্দিষ্টতায় পাক খেতে খেতে।

বস্তুত প্রতিটি লক্ষ্যভেদী গল্পকৃতিতে ওয়াসির অন্বিষ্ট জীবনের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আরেক জীবন, বাস্তবের অন্তরালে আরেক বাস্তব এবং উপস্থাপিত কুশীলবদের আড়লে ভিন্নতর অস্তিত্বের আবিস্কার। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর গল্পভাষা প্রখর ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রমাণ দেয়। যেমন 'কালাশনিকভের গোলাপ'। এই গল্পের নির্মাণ পাঠকের বিস্ময় জাগায়। গল্পকৃতির তৃতীয় অনুচ্ছেদটি এরকম: 'শেষ মার্চের সন্ধায়

বাতাসে মিহিধুলো। রাস্তার হেলোজন আলোয় ধুলোমাখা পেঁজা কালচে তুলোর মতো অচঞ্চল ধোঁয়া। পাঁচমিশালি গন্ধ। ডিজেলে-পোড়া গন্ধ আর অ্যামোনিয়ার দমকা ধাক্কার সঙ্গে পেরে না উঠেও তাজা গাঁদা ফুলের দুরুদুরু সুবাস। আল্প দূরে বাসস্ট্যাণ্ডের কোলাহল আর আশপাশের ক্যাটক্যাটে আলোর ফাঁক ফোঁকরে কাঁচা অন্ধকারের কিছু নির্দোষ গন্ধও বাতাসে ঘুরে ফেরে।' ওয়াসির বিশেষণ প্রয়োগ অনবদ্য যা কার্যত তাঁর সমস্ত গল্পেই উপস্থিত। তাব সবচেয়ে অভিনব হল বাস্তবের নানা মাত্রার সংশ্লেষণ। আর, তা করতে গিয়ে ওয়াসি পাঠকের প্রত্যশায় নিহিত রৈখিকতাকে আমূল বিনির্মাণ করে নিয়েছেন। আরও একটি কথা বলা দরকার। গল্প লেখার আগে কতখানি নিবিড় প্রাক-প্রস্তুতি প্রয়োজন তা এই গল্পে ওয়াসি দেখিয়েছেন। যেন উত্তর-প্রজন্মের গল্পকারদের জন্যে তাঁর বার্তা : এত সহজ নয়, শিল্পনির্মাণ নিরবচ্ছিন্ন শ্রম ও মেধার দাবিদার।

॥ দশ ॥

কিছুটা কি কিমিতিবাদী ভাবনারও অনুসৃতি দেখি তাঁর মধ্যে? কথাটা একেবারে আগ্রাহ্য করার মতো নয়। এ কে ৪৭ অ্যাসোল্ট রাইফেল নিয়ে যে এমন বহুমাত্রিক গল্পকৃতি নির্মাণ করা যায় তা পাঠক হয়তো ভাবতেই পারেন না। বয়ানের ভেতরে ভাবনা ও ভাষার সূক্ষ্ম মোচড়গুলি বিশেষভাবে লক্ষনীয়। যেভাবে এত নাগরিক শ্লেষ মিশে রয়েছে তাতে গল্পকারকে বাহবা জানাতেই হয়। নেপথ্যভূমিতে তথ্যের ব্যবহার অনেকটা সাংবাদিকের মতো। এত কিছু সত্ত্বেও বয়ান যে একবাচনিক হয় না, এর কারণ প্রতিবেদনের গভীরে কিমিতিবাদী মুহূর্তের কুশলী নির্মাণ :

'কবিতা আমাকে কখনও ছেড়ে যায়নি। আজো লিখি।'

'আজও! '

'কাল রাতেও লিখেছি, অবশ্য মাত্র এক লাইন : a rose is a raliant rose…'

'মানে কী?'

'কবিতার মানে হয়! উপলব্ধি করতে হয়। আমরা বন্দুককেও উপলব্ধি করতে হবে।'

'বন্দুকটাও কবিতার মতো?'

'কবিতাই।'

‘তুমি তাহলে সেই কবি যে কবিতায় বন্দুক রচনা করে?’

‘উল্টোটা। বন্দুকে কবিতা।’

অতএব বাস্তবের বিভিন্ন অবতল যে অবলীলায় সংশ্লেষিত হয়েছে এই বয়ানে, তা হয়তো অনিবার্যই ছিল। এই সূত্রেই পাঠকও পৌঁছে যান কিমিতিবাদী উপসংহারে : ‘রোকন উদ্দিন ওরফে দেবাশীষের কোলে সলিড ওয়ান পিস এ কে আরামে দোল খায়। ঠান্ডা ঘোর ছাই রঙ ব্যারেলে আঙুলগুলো তার কেঁপে কেঁপে পিছল কাটে। ... গোলাপ বিষয়ক কবিতার দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে বিভোর মিখাইল টিমোফেইভিচ কালাশনিকভ হঠাৎ অন্যমনষ্ক হয়ে ভাবেন, কৃষিযন্ত্র! তেজী লক্ষ্যভেদী মারণাস্ত্রের বদলে নিরীহ চাষবাসের যন্ত্র! কিন্তু লক্ষ্যভেদই যে আসল, কে কতটা মোক্ষম ভেদ করতে পারছে এর বাইরে কিছু ছিল, না আছে! কৃষির কথা ভাবতে গিয়ে এক চিমটি আগাম গোলাপের সৌরভ নাকে টোকা দেয়। প্রিয় ফুল। আস্তে, হেলে-দুলে নির্যাসটুকু মাথার ভিতর পর্যন্ত পৌঁছে যেতে মিখাইলের সুস্থির লাগে, আবার বুকে কোথাও সিরসিরও। আসছে, হৃৎপিণ্ডের সব কটা তন্ত্রী ঝাঁকিয়ে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি আসছে ... ’

যে-নির্মম রাষ্ট্রিক পরিস্থিতিতে তার সহায়ক রাজনৈতিক শক্তি মারণাস্ত্র নির্মাণে অকাতরে অর্থব্যয় করে এবং ক্ষুধা-দারিদ্র্যের পৃথিবীতে যার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সেই যুগান্তকারী কৃষিযন্ত্র বানানোর সামর্থ্যকে ভুল পথে পরিচালিত করে– ওয়াসি যেন সেই পরিস্থিতির প্রতিও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। এও একধরণের শিল্পিত প্রতিবাদের অভিব্যক্তি। মনে পড়ে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে মহাশিল্পী পারলো পিকাসো বেয়োনেটের দিকে একগুচ্ছ গোলাপ ছুঁড়ে দিতে চেয়েছিলেন। আর, ওয়াসি ভেবেছেন গোলাপ বিষয়ক কবিতার দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি রচনায় বিভোর কালাশনিকভের কথা। এভাবে তাঁর গল্পকৃতি সাম্প্রতিক যুদ্ধোন্মাদ দুনিয়ায় শিল্পকে ব্যবহার করে প্রতিরোধের অস্ত্র হিসেবে। যথাপ্রাপ্ত বাস্তব থেকে নিষ্ক্রমণের জন্য পরাবাস্তবে আধারিত প্রতীকায়ণ হয়ে ওঠে বহুমাত্রিক মুক্তির বার্তাবহ।

ওয়াসি দেখিয়েছেন, আপাত অতি তুচ্ছ কোনো মুহূর্তও সার্থক ছোট গল্পে রুপান্তরিত হতে পারে। ‘মুগ্ধতার কারসাজি’ গল্পে যেমন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মনজুর হাসানের চোখ দিয়ে ফ্ল্যাট নির্মাণের অতিতুচ্ছ অনুষঙ্গ লক্ষ করতে করতে বয়ানের সম্ভাব্য অবতলে পৌঁছে যাই। শাহানা যখন তার স্বামীকে আনবিলিভেবল লাইটনেস আব ব্রিক্‌স্ নামে বই লেখার কথা বলেন, স্পষ্টতই তার মধ্যে মিলান কুন্দেরার বহুপঠিত বইটির ছায়া এসে পড়ে। তবে ওয়াসি খুব সূক্ষ্মভাবে এর মধ্যে খানিকটা মজা এরং শ্লেষ সঞ্চায় করে দিয়েছেন। এই গল্পকৃতিতে যেহেতু ঘটনা বলে কিছু নেই, সমস্তই চিন্তার বিবিধ বিচ্ছুরণ– পাঠক

টের পায়, সব কিছুই ইদানীং গল্পত্বের অবলম্বন হতে পারে। গল্পকারের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে তাঁর বয়ানের লক্ষ্যভেদী হয়ে ওঠা।

॥ এগারো ॥

'পা' গল্পটি পড়তে পড়তে অনিবার্যভাবে মনে আসে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে। ১৯৯৭ সালের ৩রা জানুয়ারি কথাশিল্পী ইলিয়াস ইতিহাসের মানুষ হয়ে গেছেন। তাঁর বারো বছর পরে অর্থাৎ ২০০৯ এ গল্পটি লেখা হয়েছে। এই নিবন্ধ-প্রয়াসীর সঙ্গে ইলিয়াসের দেখা হয়েছিল ১৯৯৬-এর আগস্টের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায়, তাঁর টিকাটুলির বাড়িতে। ঘন্টা তিনেক তাঁর সঙ্গে বার্তালাপের সময় কাটা পায়ের প্রসঙ্গ প্রায় এমনিভাবে ফিরে এসেছিল। এ ছাড়া কিছু কিছু মুদ্রিত আলাপচারিতায় ও ওয়াসির বয়ানে উল্লিখিত অনুপুঙ্খগুলি ফিরে ফিরে এসেছে। প্রিয় কথাকারের প্রতি এ আসলে ওয়াসির বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য। তবে সেই সঙ্গে আবারও লিখতে হয়, যে কোনো কিছুই হতে পারে ছোটোগল্পের আধেয়– এই যেন বোঝাতে চেয়েছেন তিনি। শুধু গ্রহিষ্ণু মন নিয়ে খোলা চোখে তাকিয়ে থাকতে হয় জীবনের দিকে। নইলে কি আর 'গ্যালারি'-র মতো গল্প লেখা সম্ভব? তবে ফিরে ফিরে পড়তে ইচ্ছে করে 'লাইলি সুন্দরী ও জীবনযাপনের রূপকথা' গল্পটি। এই প্রতিবেদনের অন্যত্র বাস্তব ও পরাবাস্তবের যে দ্বিবাচনিক প্রস্থনায় কথা লিখেছি, তার সবচেয়ে চমকপ্রদ উপস্থিতি সম্ভবত এই গল্পকৃতিতে দেখতে পাই। মনে পড়ে, পরাবাস্তববাদের প্রবক্তা আঁদ্রে ব্রেতোঁ `Surriallsm and Painting' বইতে লিখেছিলেন: 'Everything I love, everything I think and feel, predisposes me towards a particular philosopty of immanence according to which surreality would be embodied in reality itself and would be neither superior nor exterior to it. And reciprocally too, because the container would also be the content [MFA Publications: Boston : 2002 : 46]

এভাবে হয়ত ওয়াসি ভাবছেন না। তবে পরাবাস্তবের উপস্থিতি বাস্তবের গভীরে– এই প্রত্যয় তাঁরও। ভিন্ন বৈশ্বিক ও নান্দনিক পরিস্থিতিতে তিনি রূপকথা খুঁজে পান জীবনযাপনের গভীরে এবং নিজস্ব চিন্তাভাবনায় তাকে উপস্থাপিত করেন। 'লাইলি সুন্দরী' কে না লিখে ভাবতে পারি লাইলি কী! আরফান আলীদের দিশেহারা করে বড়কদুয়ার খালে কেন দেখা দিয়েছিল ঐ লাইলি সুন্দরী? কেনই বা রহস্যময় ঘটনার পরে মহামারী লাগল গ্রামের নর-নারী ও কাঁঠালগাছের সম্ভারে। আসলে কী বোঝাতে চেয়েছেন গল্পকার? এর মীমাংসাসূত্র খুঁজতে হবে বয়ানেই। যেমন :'গাছপালাহীন, ছায়া ও হিম-বাতাসশূন্য বিরান প্রান্তরে দৃষ্টি তাদের ঘুরে ঘুরে জ্যোতিহীন ধূসরতায় গিয়ে মেশে। তারা ভাবে,

রূপকথার অতীত তাদের টেনে ধরে আছে। কিন্তু রূপকথা ও বাস্তব এক নয় তারা জানে। লাইলি সুন্দরীর মোহ তাদের উজ্জীবিত করতে পারে না। বাঁশ আর কাঁঠালের অফুরান বাগানের কাহিনিতে তাদের চাঞ্চল্য জাগে না। প্রচণ্ড টানা রোদে যখন আকাশ নুয়ে পড়ে, তারা অধীর হয়ে বৃষ্টির অপেক্ষা করে। আর বৃষ্টির নাজেহাল দিনে রোদের অপেক্ষায় বসে থাকে। অবাস্তব, অলীক অতীতকে নিয়ে দুঃখ, হতাশা, চাঞ্চল্য কোনো অনুভূতিই তাদের বিদ্ধ করে না। তারা জানে, মৃত্যুই একমাত্র বাস্তব রোদ-বৃষ্টির যে-কোনো দিনে কি রাতে।' চমৎকার দার্শনিকতা-ঋদ্ধ বাচন। তবু প্রশ্ন জাগে বড়কদুয়া গ্রামের আরফান আলী বা গ্রামবাসীর পক্ষে কি বোধের এই মাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব? অর্থাৎ তা কি ওয়াসির নিজস্ব বিশ্বাস ও ভাবাদর্শ দ্বারা উজ্জীবিত নয়? অবশ্য তাতে গল্পকৃতিতে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে নিঃসন্দেহে। হ্যাঁ, এই গল্পকৃতি গভীরভাবে চিহ্নায়িত। যদি ভাবি, এ হলো স্বপ্নতাড়িত, স্বপাহত বাংলাদেশেরই সংকেতগর্ভ কথকতা– সম্ভবত ভুল হবে না খুব।

তাই ওয়াসি আহমেদের গল্পবিশ্ব পরিক্রমা অফুরন্ত। কখনও ফুরোয় না তাঁর গল্পপাঠ জনিত বিস্ময়; প্রতিটি নতুন পড়া হয়ে ওঠে আবিষ্কার, নতুন চমকের উদ্ভাসন। তিনি সেই বহুস্বরিক দ্যোতনার সন্ধানী যা লুকিয়ে থাকে যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের আনাচে-কানাচে। যে-বাস্তবকে খুঁজতে খুঁজতে তিনি রূপান্তরিত করে নেন নিজস্ব যাদুকরী কল্পনায়। এই যে খোঁজা তা-ই তাঁর বিশ্লেষণ অর্থাৎ জিজ্ঞাসার ছলে ব্যাখ্যা এবং ব্যাখ্যাচ্ছলে জিজ্ঞাসা। তাই সমাপ্তিবিহীন উপসংহারে স্মরণ করি বিনির্মাণপন্থার প্রবক্তা জাক দেরিদার বক্তব্য : 'All these texts, which are doultleess the interminable preface to another text that one day I would like to have the force to write, or still the epigraph to another that I would never have the audacity to write, are only the commentary on the sentence about a labyerinth of uphers ... Positions: The University of Chicago Press: 1942 : 5)

ওয়াসির গল্পবিচারে সীমান্ত নেই কোনো। নিরন্তর প্রসারিত হয়ে চলেছে তা। 'বীজমন্ত্র' গল্পে 'তলকুঠুরির ভেতর পতনের আওয়াজটা' নানাভাবে শুনতে শুনতে তাঁর যে পথ চলা তাতে আকাশের আহ্বানে সাড়া দেওয়াও জরুরি, তাই তিনি সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পে মূলত জিজ্ঞাসার উদ্বোধক, ভাষ্যকার এবং অতন্দ্র প্রহরী। গল্পকৃতির নির্মাণে এই জন্যেই তিনি ক্লান্তিহীন এক পথিক যাঁর দীক্ষা ও বীক্ষা আন্তর্জাতিক সৃজনী-চেতনায় সদাজাগ্রত।

লেখক প্রখ্যাত সাহিত্য বিশ্লেষক ও কবি। আসাম কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্তন উপাচার্য। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রাক্তন রবীন্দ্র অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা শতাধিক।